CenRaPS Journal of Social Sciences

International Indexed & Refereed

ISSN: 2687-2226 (Online)

http://journal.cenraps.org/index.php/cenraps

Original Article

doi.org/10.46291/cenraps.v3i1.67

Reconstruction of Dhaka City in the 18th Century by the Nawab Family in the Light of Islamic Civilization

***Mutasim Billah[1] *Md. Sadequzzaman[2] *Md Kaosar[3]**

The Khwaja family of Dhaka having obtained the title of 'Nawab' from the Government of British India reconstructed the city of Dhaka in the 18th century following the light of Islamic civilization. ‘Knowledge’ and ‘charity’ were the basic foundation of Islamic civilization. Similarly, In islamic civilization it was the regular activities to maintain sustainable public welfare oriented architecture. The contemporary period of the Nawab family, they made name and fame for themselves to perform their humanitarian activities. Through business income they developed a waqf system and spent it for various welfare purposes such as: patronage of modern education, institutions, medicine and technology; assistance to the people who were suffering in natural calamities in national and international arena, and they maintained friendship with government bureaucrats. In Islamic civilization we see various attributes such as: human rights, freedom of thought and practicing religion, Muslim family bondage, social welfare, medicine, orphanage, architecture, aesthetics of utensils, library, beauty of modern and scientific discoveries, beauty of environment, gardening, characteristic beauty, fine taste etc. In the eighteenth century, we found similar characteristics in Dhaka City which inspired us to compare the ‘Dhaka city’ reconstruction according to the light of ‘Islamic civilization’. If we see the nature of muslim’s city in medieavel period around the globe, then we found similar features. In this article we try to learn the hidden power of the Nawab family which led them to ‘reconstruct’ the `Dhaka city' through the exploration of various historical books, to see the current activities of their organization, trustees and observing their way of life.

Key Words: Nawab family, Islamic civilization, Public welfare, Bangladesh

[1] Lecturer, Department of Archaeology, Comilla University, Email-mutasim.b@cou.ac.bd
[2] Assistant Professor, Department of Archaeology, Coumilla University, Email- s.zaman.tan1401@gmail.com
[3] Resercher, King saud University, Riyadh, Email- tajulkaosar@gmail.com

ইসলামী সভ্যতার মডেল অনুসরণে আঠার শতকে নবাব পরিবারের ঢাকা 'নগর' এর পুনর্গঠন

ভারতীয় উপমহাদেশের কাশ্মীর থেকে আসা খাজা পরিবারের নবাবরা মুলত ইসলামী সভ্যতার রেখে যাওয়া মডেলকে অনুসরণ করেই ঢাকা নগরের পুনর্গঠন করেছিলেন। 'জ্ঞান' ও 'দান' ছিল ইসলামী সভ্যতার মুল ভিত্তি। সেই সাথে ইসলামি সভ্যতায় টেকসই জনকল্যানমূখী স্থাপত্য সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ছিলো নিয়মিত কাজের অংশ। কাশ্মির থেকে আসা খাঁজা পরিবার যাদেরকে ব্রিটিশরা নবাব উপাধি দিয়েছিলো তাদের সময়কালে আমরা দেখতে পাই তাঁদের ব্যবসা ও তা থেকে অর্জিত বিপুল অর্থ সামর্থ্যের সঠিক ব্যবহার, ওয়াকফ ব্যবস্থা, প্রজাগণের হিতসাধন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসাধারণ, সরকার ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সহায়তা প্রদান, আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, সরকারি আমলাদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ইসলামি সভ্যতায় আমরা যেমন মানবাধিকার, চিন্তা ও ধর্মের স্বাধীনতা, মুসলিম পরিবার, সমাজের কাঠামো, চিকিৎসা, ইয়াতিমখানা, স্থাপত্যকলা, তৈজসপত্রের নান্দনিকতা, লাইব্রেরি, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের সৌন্দর্য, পরিবেশের সৌন্দর্য, বাগান চর্চা, চারিত্রিক সৌন্দার্য, সূক্ষ রুচিবোধ দেখতে পাই; আঠার শতকে ঢাকার খাজা নবাব পরিবারের তৎকালীন ঢাকা নগর পুনর্গঠনে আমরা অনুরূপ মানদন্ড দেখতে পাই, যা আমাদেরকে 'ইসলামী নমুনা সভ্যতার' সাথে ঢাকার নগর পুনর্গঠনের মানদন্ডের সাথে তুলনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মুসলিম জনগোষ্ঠী পৃথিবীর নানা প্রান্তে যে নগর গঠন, পুনর্গঠন করেছে সেসব জায়গার বৈশিষ্ট্যগুলো ছিলো অনেকটা অনুরূপ। নবাবদের 'নগর' পুনর্গঠনের অন্তর্নিহিত শক্তি নিয়ে বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের উৎসের পাশাপাশি বর্তমান খাজা পরিবারের সংগঠন, তাদের জীবনযাপন পর্যবেক্ষনের মধ্য দিয়ে জানার চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

মৌলিক শব্দঃ নবাব পরিবার, ইসলামী সভ্যতা, জনকল্যান, বাংলাদেশ

ব্রিটিশ আমলে ঢাকার পুনর্গঠনে নবাবদের অনুরূপ কার্যক্রম তাদের ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানকেই সামনে নিয়ে আসে। ড.রাগিব সারজানির 'নমুনা সভ্যতায়' তাঁর বর্ণিত ইসলামি সভ্যতার গুণাবলির সঙ্গে নবাবদের কার্যক্রমের বেশ মিল পাওয়া যায়। তিনি সভ্যতার সংজ্ঞায়ন করেছেন যেখানে সভ্যতা হলো- প্রথমত মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যকার ক্রিয়াকর্মের, দ্বিতীয়ত সমাজে বসবাসরত অন্য মানবমন্ডলীর সঙ্গে তাদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁর আচার-আচরণের, তৃতীয়ত মানুষ ও পৃথিবীর পরিবেশের- যেখানে আছে পশুপাখি, মাছ, বৃক্ষরাজি, ভূমি, খনিজ সম্পদ, অন্যান্য ঐশ্বর্যসহ যাবতীয় সৃষ্টি-মধ্যকার সম্পর্কের ফলাফল (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ২৩)। এ সংজ্ঞার আলোকে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখর হলো মানুষের পক্ষে উল্লিখিত ৩টি পর্যায়ে সর্বোত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারা, আর অসভ্যতা ও অধঃপতনের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত স্তর হলো একই সঙ্গে উপরোক্ত ৩টি বিষয়ে সম্পর্কের অবনতি ঘটা। কাশ্মির থেকে আসা খাঁজা পরিবার; যারা ব্রিটিশদের থেকে নবাব উপাধি প্রাপ্ত, তাদের জমিদারী আমলে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যর আলোকে বর্তমান ঢাকা চারবার- মোগল সুবা, পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ, পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আঠারশতকে সেই ঢাকার 'নগর' পুনর্গঠন করতে দেখি কাশ্মির থেকে আসা নবাব পরিবারের।

বাংলাদেশ; যার তিন দিক থেকে পাহাড়ী অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত। তা যেন প্রাকৃতিকভাবেই বাংলার প্রতিরক্ষা ব্যুহ (শাহনাওয়াজ, ১৯৯৯, পৃ. ১৪)। এখানে মৌর্য সময় থেকে মানব বসতির আলামত পাওয়া যায়। এখানে প্রাচীন যুগে বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈনসহ নানা নৃ-গোষ্ঠী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বসবাস ছিলো। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও সেনরা প্রাচীন যুগের শাসক ও রাজক্ষমতায় থাকার মধ্যে অন্যতম। পাল ধর্মাবলম্বীদের শাসনামলে এ অঞ্চলে অসংখ্য বিহার গড়ে ওঠে, যেগুলো মানের বিবেচনায় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় মানের। অনুরূপভাবে অসংখ্য মন্দির, টোলের মাধ্যমে হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিলো। উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। মধ্যযুগেই বাংলায় নগর বিন্যাস্ত হয়েছিলো সেটি ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত

(ভাদুরী, ১৯৮৬, পৃ.৪২)। মধ্যযুগে গড়ে ওঠা নগরীগুলোর মধ্যে অন্যতম বর্তমান রাজধানী ঢাকার সোনারগাও অঞ্চলসহ, পুরাণ ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকা। মধ্যযুগে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল নতুন করে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচীন গতিধারায় নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। এর মুল নিয়ামক ছিলো এ অঞ্চলে নতুন ধর্ম ও রাজনৈতিক শক্তির উত্থান, যা সনাতন বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্মীয় কাঠামোয় গড়ে ওঠা বাঙালি সংস্কৃতির ওপর অবস্থান গ্রহণ করেছে, এই নতুন শক্তি হলো ইসলাম যা আমরা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলগুলোতেও লক্ষ করেছি। এর বৈশিষ্ট্যগুলো সকল দেশে, সকল যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ছিলো বলে তুলনামূলক অধ্যয়নে দেখতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ে এ প্রবন্ধে বেশ কিছু তথ্য ও উপাত্ত আলোকপাত করা হয়েছে। এই মুসলিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় এদেশেও কর্মভূমিকায় এ দেশীয় হয়ে পড়েন (শাহনাওয়াজ, ১৯৯৯, পৃ.৪)। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগোষ্ঠীর দীর্ঘকালিন এদেশে অবস্থান ও তাদের তৈরি করা কাঠামোতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চ মুসলমান শক্তির অভ্যুদয় প্রচলিত সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। এ সময় মুসলিম সুলতানদের সহযোগিতায় একদিকে তাঁদের ধর্মীয় ও সংস্কৃতির অনুসঙ্গী হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার বিকাশ ঘটে। অপরদিকে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিমদের প্রতি সহনশীল মনোভব প্রকাশ করেন। এবং প্রচলিত সংস্কৃতিকে পৃষ্ঠপোষণ করেন। এরই পথ ধরে মধ্যযুগে বাংলায় ঘটে রূপান্তর (শাহনাওয়াজ, ১৯৯৯,পৃ.১০)। মুসলিমরা এখানে ব্যবসার মধ্য দিয়ে আগমন ঘটলেও পরবর্তীতে সূফীদের তৈরি করা মাঠে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজির রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাদখলের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ইসলামের বিস্তার ঘটে। একদিকে সূফীধারা মানুষকে ইসলামের দিকে দীক্ষিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। অপরদিকে রাজনৈতিকভাবে ইসলাম এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বর্ণবৈষম্য না থাকায় ধর্মবর্ন নির্বিশেষে বিপুল পরিমাণ বৌদ্ধ, ও নিম্নজাত হিন্দুরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে (এবাদত হোসেন, এর পদাবলী সমীক্ষা, পৃ; ২১-২২ থেকে উদ্ধৃত করেছেন শাহনাওয়াজ, ১৯৯৯)। রাজনৈতিকভাবে ইসলামের আগমনের মধ্য দিয়ে (১৩ শতক) এ অঞ্চলে মাদরাসা, মক্তব, খানকাহ, লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান অর্জনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সুদুর ইয়ামেন থেকে শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা বাংলায় ছুটে আসেন (১২৭০ থেকে ১২৭৭ সালের দিকে)। সোনারগায়ের মোগরা পাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন উপমহাদেশের প্রথম দরসে বুখারীর মাদরাসা। স্বাধীনভাবে সুলতানরা বাংলায় শাসন (১৩৩৮-১৫৩৮) করার পরে এদেশ শাসন করেন মোগলরা। এরপর ক্ষমতা চলে যায় পশ্চিমা ব্রিটিশদের হাতে (১৭৫৭-১৯৪৭)। মুসলিমরা শিক্ষা তথা জ্ঞান ও বিজ্ঞান থেকে এ সময়ে ধীরে ধীরে অনেকটাই পিছিয়ে পরে। এই ব্রিটিশ আমলে পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠী ও ঢাকা 'নগর' এ কাশ্মির থেকে আসা খাজা পরিবার ও এ পরিবারের উপাধি প্রাপ্ত নবাবদের ব্রিটিশদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে, একই সঙ্গে জনকল্যানমূখী কাজে এ অঞ্চলের মানুষকে সম্পৃক্ত করে নিজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ শহরকে বদলে দিয়েছেন। যদিও ঢাকার আদি বা খানদানি নওয়াব পরিবার ছিল নিমতলী কুঠির নায়েব-নাজিমরা, যে-বংশের শেষ উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। অবশ্য নায়েব-নাজিমদের আগে ঢাকা যখন ছিল বাংলার রাজধানী এবং ঢাকায় বসে যে- মুঘল সুবাদাররা বাংলা শাসন করতেন তাঁদের বলা হতো নওয়াব। (মামুন, ২০১৭, পৃঃ ১৬) তবে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া নবাব উপাধিতে খাজা পরিবার তাদের কর্মভূমিকায় তৎকালীন ঢাকাসহ এর আশেপাশের অঞ্চল থেকে শুরু করে বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, টাঙ্গাইলসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানুষের মনে নবাব হিসেবেই স্থান করে নেয়।

ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে মুসলিমদের ব্যবসা ছিলো অন্যতম পেশা, যার মধ্য দিয়ে তারা পৃথিবীর পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছেন। এদেশে আরব বণিকদের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। ঠিক তেমনি আঠার শতকে যখন ব্রিটিশদের দ্বারা একে একে মুসলিম আধিপত্য ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছিলো। কিন্তু কাশ্মির থেকে আসা খাঁজা পরিবার, যাদের সাথে ইরাক থেকেও খাঁজা পরিবারের আরেকটি ধারা যুক্ত হয়েছিলো এই উভয় পরিবারের আয়ের পথ ছিলো ব্যবসা; এদের বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা বাংলার তৎকালীন অন্যতম প্রধান নগর ঢাকা ও এর

আশে পাশের পরিবেশ তাদের সহযোগিতায়, পরামর্শে, দিকনির্দেশনায় নতুন করে শৌর্য, বীর্যে, শিক্ষায়, ব্যবসায়, চিকিৎসায়, কৃষিতে, ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যে আবারও মুল গতি ফিরে পায়। আগে থেকে পুরনো শহর ও নগর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ঢাকাকে নবাবরা এসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁরা নাগরিক সেবায় বিদ্যুৎ, সুপেয়পানী, চিকিৎসা, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে; মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায়; বাগানবাড়ী, পঞ্চায়েত কমিটির গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়ায়, মুসলিমদের আলাদা স্থানে কবরস্থান নির্মাণ, নগরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলোকায়নসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নগরবাসীর জন্য নিবেদিত ছিলেন। এটি মুলত তাদের পরকালীন বিশ্বাস, ইসলামী শিক্ষা; জ্ঞান ও দান, ইসলামী অনুশাসন, সূফীবাদের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস, ব্যবসা বাণিজ্যর সাথে সম্পর্কিত। যুগে যুগে ইসলাম যত জায়গাতে বিস্তৃত হয়ে টেকসই হয়েছে সেখানে ব্যবসায়ীদের একটা বড় ভূমিকা আছে। এর পাশাপাশি ওয়াকফ ব্যবস্থা, বাগান, মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতা, লাইব্রেরি, চিকিৎসার প্রতি ঝোক প্রবণতা এগুলো মধ্যযুগ থেকে মুসলিমদের চর্চায় চলে এসেছে। ইসলামে রয়েছে গণমালিকানার বিধান। এ ধরণের মালিকানায় একটি বিশাল মানবসমাজের অথবা কয়েকটি মানব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ থাকে এবং সকল সদস্যই তার উপকারিতা লাভ করে। ব্যক্তি সমাজের সদস্য হওয়ার কারণেই গণমালিকানা থেকে উপকার পেয়ে থাকে, যদিও তার জন্য বিশেষ অংশ নির্ধারিত থাকে না। যেমন মসজিদ, পাবলিক হাসপাতাল, রাস্তা, নদী, সমুদ্র, ব্রিজ, সেতু ইত্যাদি। শাসক বা শাসকের প্রতিনিধি বা কর্তৃপক্ষ এগুলোর মালিক না হয়ে বরং তাঁরা দায়িত্ব হিসেবে এর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে যা মুসলিম সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ২০৫)। তাই এ ধরণের কর্মকান্ডে মুসলিমরা বরাবরই সম্পৃক্ত ছিলো। যা খাঁজা পরিবারেও দেখা যায়। খাজা পরিবার নিজেদের পারিবারিক সম্প্রীতি, সম্পর্ক অটুট রেখে ইসলামী সভ্যতার গুণাবলীকে আত্নস্থ করে তা নিজেদের ও অন্যদের জন্য অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। যতদিন তারা এ গুণাবলি ধরে রাখতে পেরেছেন ততদিন তারা সৃজনশীল, সৃষ্টিশীল কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পেরেছেন। যখন এ বিষয়গুলো তাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গিয়েছে, তারাও তখন তাদের ঐতিহ্যকে আর ধরে রাখতে পারেননি। যা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নগরের উত্থান ও পতনের অনুঘটকের সাথে সম্পর্কিত। খাঁজা পরিবারকেও শতবছর ঐতিহ্য, সৃজনশীল, সৃষ্টিশীল কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়। ১০০ বছরের মধ্যে পরিবারটি বৈভব ও ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আবার বিত্তহীন ও অজানা হয়ে যায়। এর কারণ হিসেবে মুনতাসির মামুন (জন্ম-১৯৫১) উল্লেখ করেছেন- খুব স্বল্প সময়ে নওয়াব পরিবারের উত্থান ও পতনের একটি কারণ তারা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি বা চানওনি। প্রগতি এড়িয়ে গেছেন। ফলে, কালের গতিতে তাঁরা হারিয়ে গেছেন (মামুন, ২০১৭ পৃঃ ৪৭)। তবে তাদের পতনের কারণটি তিনি ধরতে পারেননি বলে অনুমেয়। বরং নবাবদের নিজস্ব ভাষ্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধান যোগ্য। স্বয়ং নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজেই সে কথা লিখেছেন "মৌলভী আবদুল্লাহর সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই পরিবারের প্রতি আল্লাহ যেসব অনুগ্রহ করেছেন তা একমাত্র তাঁর ও তাঁর পুত্রদের 'নেক নিয়ত' ও সৎকর্মের কল্যাণেই হয়েছে ও হচ্ছে (আবদুল্লাহ, ১৯৯৮, পৃ. ২৮-৩১)। সুতরাং এ কথা সহজেই বলা যায় ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যাবলি ও শিক্ষাকে নওয়াব পরিবার বংশ পরম্পরা থেকে পেয়ে আসছে। যা একটি পরিবারকে টেকসই জনকল্যানমূখী স্থাপত্য বিনির্মাণ, সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে 'জ্ঞানে' ও 'দানে' অগ্রগামী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যখনই এ বিষয়ে তাদের উদাসীনতা ও পদস্খলন ঘটেছে তখনই তাঁরা তাদের অবদানকে আর চলমান রাখতে পারেননি। ঢাকায় খাজা পরিবারের প্রচেষ্টায় ও কর্মতৎপড়তায় মুসলিমজনগোষ্ঠী নির্বিশেষে বাংলার জনগন শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে পিছিয়ে পড়া থেকে আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আগ্রহী হয়েছিলেন। দেশে প্রথম জনগনের সেবায় বিদ্যুৎ সরবরাহ, জ্ঞান ও দানের সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণে তারা মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সভ্যতারই বাস্তবায়ন করেছেন। যা বর্তমান বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে আলোকিত সমাজ গড়তে সহায়তা করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশ, সৌন্দর্য চর্চার মাধ্যমে তাঁরা একটি সহপরমত সহিষ্ণু সমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঢাকার নবাব পরিবার- যারা খাঁজা পরিবার নামে পরিচিত। তাদের দুটি ধারা রয়েছে। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক, লেখক-গবেষকই কাশ্মির থেকে আগতদের খাজা পরিবারের উল্লেখ করে থাকেন। এর বাইরে বাগদাদ থেকেও এসেছে খাজা পরিবারের আরেকটি ধারা। এই বাগদাদের খাজা পরিবার থেকে আসা খাজা ইউসুফ জান নওয়াব আব্দুল গণির মেয়ে বিয়ে করেন। খাজা ইউসুফ জানও পরে ব্রিটিশের কাছ থেকে 'নওয়াব' খেতাব পান। নওয়াব ইউসুফ জান ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন (হায়াৎ, ২০১৮, পৃ. ১৩)। কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশে আগমনকারী খাজা পরিবারের তৃতীয় আদি পুরুষের নাম খাজা আবদুল্লাহ (আব্দুল্লাহ, ১৯৮৬, পৃ. ২২-২৫), তিনি ১৭৩০ সালের দিকে তাঁর বড় ভাই খাজা আবদুল ওহাবের সাথে কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আসেন। বড় ভাই এদেশে ব্যবসা করলেও আব্দুল্লাহ পীর-মুরিদী প্রথায় ইসলামের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেকালের ঢাকার অন্যতম দরবেশ শাহ নূরী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরম্পরায় তাঁর সন্তান খাজা আহসানুল্লাহও একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি ১৭৯৫ সালে মক্কায় হজ্বে গিয়ে ইন্তেকাল করেন (আহসানুল্লাহ, অপ্রকাশিত উর্দু পান্ডুলিপি, পৃঃ ৪৪-৫৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। এই খাজা আহসানুল্লাহর পুত্র খাজা আলীমুল্লাহই ছিলেন ঢাকা নওয়াব পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা (আলমগীর, ২০১৪, পৃঃ ১০)। এই খাজা আলিমুল্লাহ তাঁর বাবার ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইসলামী অনুশাসন, চাচার হাফিজুল্লাহর অধীনে থেকে ব্যবসা পরিচালনা ও জমিদারী পরিচালনা করতেন, সেই সাথে ইংরেজ শাসক ও কর্মকর্তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছেন (রহিম সাবা, অপ্রকাশিত ফারসী পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৩৪-৩৮; ব্রেডলি বার্ট, ১৯২৫, পৃ. ১৭৪-০৭৮)। সর্বোপরি তারা যে রীতি-নীতি, ইসলামী জ্ঞান ও অনুশাসন মেনে জীবন পরিচালনা করেছেন সেই অর্জিত জ্ঞান তাদেরকে টেকসই জনকল্যানমূখী কাজের ভীত গড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

খাজা পরিবারের নগর পুনর্গঠনের নিয়ামকসমূহের মধ্যে শুরুতে তাদের বংশ পরম্পরায় ব্যবসার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। এর পরবর্তী ওয়াকফ দানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন খাজা আলীমুল্লাহ তিনি আটিয়া পরগণার জমিদারী দরিদ্রদের জন্য আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে দেন (তায়েশ, ১৯৮৫ পৃ. ১৮১)। পরবর্তী সময়ে খাজা আলীমুল্লাহর কাছে তার পরিবারের অন্যান্যরা তাদের জমিজমা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করেন এবং খাজা আলীমুল্লাহ ১৮৪৬ সালে একটি ওয়াকফনামা সম্পাদন করে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র খাজা আবদুল গনিকে খাজা পরিবারের সমুদয় সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। এটিই ছিল ঢাকার খাজা পরিবারের উন্নতির মূল চাবিকাঠি (ঢাকা প্রকাশ, ৭জুন ১৮৮০ এবং ১৩ মে ১৮৯৪ এবং ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ এবং পুরনো দলিলপত্র, অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত, পৃঃ এ-৭, ১৯,৩০ ও ৪২ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আলমগীর, ২০১৪)। খাজা আলীমুল্লাহ মুতাওয়াল্লী হওয়াতে একহাতে পরিবারের সকল সম্পত্তি পরিচালনা করতেন ও অন্যরা ভাতা পেতেন (ঢাকা প্রকাশ, ১৮৮০; এবং পুরনো দলিলপত্র, অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত, পৃঃ এ-৭, ১৯,৩০, ও ৪২ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। এই এজমালী সম্পত্তির তখন বাৎসরিক আয় ছিল মোট ৩ লাখ ৪৮ হাজার ৭শত ৪০টাকা (পুরোনা দলিদপত্র, প্রাগুক্ত এ-১ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর কষ্টার্জিত সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পরও অটুট রাখার বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। বুদ্ধিমত্তা, চৌকস, বিচক্ষণতা বিবেচনায় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র খাজা আবদুল গনিকে তাঁর উপযুক্ত করে জমিদারী ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য সব সম্পত্তি আবদুল গনির অধিকারে ছেড়ে দেন, উক্ত দানপত্র অনুযায়ী খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর পুত্র আবদুল গনিকে সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও নগদ দু'লক্ষ টাকা প্রদান করেন। তিনি তাঁকে তাঁর পুরো এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য পুত্র কন্যা ও আত্নীয়-স্বজনদের জন্য ভাতা ধার্য করে দেন (ঢাকা প্রকাশ, ১৮৯৬ এবং পুরনো দলিলপত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-১৯, ৩০ ও ৪২ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আলমগীর, ২০১৪)। এর ফলে ঢাকার কাশ্মীরি খাজাদের এস্টেটের একতা লাভ হয়, সম্পত্তির বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ ঘটে, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে এ পরিবারের প্রধানদের উত্তরোত্তর সম্মান বৃদ্ধির পথ পরিস্কার হয় (পুরনো দলিলপত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ

এ-৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আলমগীর, ২০১৪)। নবাব আবদুল গনিকে খাজা পরিবারের কতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল মাত্র আঠারো বছর বয়সে (ঢাকা প্রকাশ ১২১৩ থেকে উদ্ধৃত করেছেন মামুন, ২০০৮)। বিদ্যা ও বুদ্ধির জোরে পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও জমিদারীর আয় চারগুণেরও বেশি বাড়াতে সক্ষম হন, জমিদারীর ঐক্য বজায় রাখার নিমিত্তে খাজা আবদুল গনি তাঁর পিতা আলীমুল্লাহর আদর্শ অনুসরণ করতেন। পরিবারের সমুদয় সম্পত্তি তিনি একজন উপযুক্ত মোতাওয়াল্লীর কর্তৃত্বধীনে রাখতে মনস্থির করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খাজা আহসানুল্লাহকে উত্তমরূপে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ১৭)। ইসলামের প্রতি এ অনুরাগের প্রমাণ মেলে তার পুত্র আহসানুল্লাহর বেলায়ও। তাঁর বাবা আবদুল গণির মৃত্যুতে ঢাকার কালেকটর ও কমিশনার তাঁর শব মিছিলের সাথে সরকারি ফৌজ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শরিয়তের বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে তাঁর পুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহ তা গ্রহণ করেননি (নওয়াব আহসানুল্লাহ, তারিখে খান্দান পৃঃ ২৬৪ থেকে উদ্বৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নবাবদের ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের ধারণাটি নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা ছিলো না বরং তাদের ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানের অনুসরণ ও অনুকরণ করা থেকেই এসেছে। কেননা ওয়াকফ ব্যবস্থা মানবতার মুক্তি সেবা দানে একটি নির্ভেজাল ইসলামি উদ্যোগ (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ১২৯)। ওয়াকফ সিস্টেমের প্রথম প্রচলন দেখতে পাই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা। তিনি সকল স্তরের মুসলিমের জন্য ওয়াকফ ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ইসলামে প্রথম ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল সাহাবি মুখাইরিকের জমিসমূহ (আসকালানী, আল-ইসাবা, খ. ৬ পৃ. ৫৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন সারজানি, ২০০৯)। এই ওয়াকফ ব্যবস্থাপনায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অগ্রাধিকার পায়। মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল তৈরি, সড়ক ও পথ নির্মাণ, নলকূপ ও দীঘি স্থাপন, অতিথি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, গরিব, মিসকিনদের সহায়তা, থেকে শুরু করে ইসলামি সমাজের সকল চাহিদা পূরণে এমন অনেক প্রকল্পই ছিল ওয়াকফের আওতাধীন। ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য এই ওয়াকফের ইতিহাস জানাই বোধ হয় যথেষ্ট। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে এবং সেবার মানসিকতায় পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো সভ্যতাই এরকম পরোপকার ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনসেবায় অংশগ্রহণের নজির স্থাপন করতে পারেনি (সারজানি, ২০০৯, পৃ.১৩৮)। মুসলিম বিশ্বের তথা ইসলামী সভ্যতার এই ওয়াকফ পদ্ধতি ভারতীয় উপমহাদেশেও অপরিচিত ছিল না। বরং আমরা হাজী মুহাম্মাদ মুহসীন এর কথা বলতে পারি যিনি কিনা ১৮০৬ সালের ২৬ এপ্রিল এক দানপত্র লিখে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি 'আল্লাহ্‌র নামে' দান করে যান। এর মধ্যে তাঁর নিজের ও বোন মন্নুজানের কাছ থেকে পাওয়া সব সম্পত্তি ছিল। তিনি তাঁর দুই বন্ধু রজব আলী খাঁ ও সাকির আলী খাঁকে যুগ্নভাবে এই ওয়াকফ সম্পত্তি তদারকির জন্য মোতায়াল্লি নিয়োগ করেছিলেন। এভাবে ওয়াক্বফ এর পাশাপাশি ইসলামী সভ্যতা জুড়ে জ্ঞানের বিষয়ে শুরু থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হতো। এর প্রভাব ছিল খাজা পরিবারের ওপরও। নবাব পরিবারের যেমন ঘরোয়া পরিবেশে পড়াশোনার কথা জানা যায়, তেমনি অতীতে অন্যান্য ইসলামী ধর্মাবলম্বীদের বেলাতেও এর প্রমাণ পাই (আব্দুল্লাহ, ১৯৯১, পৃ.৪৭)। এ ক্ষেত্রে আবারও ভারতের হাজী মুহাম্মাদ এর বিদ্যাশিক্ষার কথা বলা যেতে পারে। যার শিক্ষার সূচনা হয় বাড়িতে, একজন গৃহশিক্ষকের কাছে। তাঁর কাছে মুহসীন আরবি ও ফারসি ভাষা ছাড়াও ইতিহাস, দর্শন, গণিত, ভূগোল, সাহিত্য এবং কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ অধ্যয়ন করেন। তার গৃহ শিক্ষকের নাম ছিল আগা শিরাজী। তিনিও ইরান থেকে ভারতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন মূলত একজন পরিব্রাজক। পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। তাকে সে গল্প শোনাতেন। শৈশবে গৃহশিক্ষকের কাছে শোনা সেই দেশ ভ্রমণ হাজী মুহসিনকে পর্যটনের নেশা জাগিয়েছিলো। পরবর্তীতে তিনি মিসরের বিখ্যাত আল-আজহার থেকে কয়েক বছর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। মুর্শিদাবাদে মুহসীনের দিন কাটত ইবাদত-বন্দেগি, শাস্ত্রালোচনা, দানধ্যান ও মানবসেবার মধ্য দিয়ে। এদেশে ব্রিটিশ আমলে শিক্ষাব্যবস্থায় হাজী মুহাম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২) এর দানেই অধিকাংশ বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ফান্ডিং হতো (শফিউল হাসান, ২০১৬, পৃ. ২৩)। হাজী মুহাম্মাদ মুহসীনের দান-জ্ঞানের

সুখ্যাতি সে সময় যেকোনো মুসলিম পরিবারেরই অজানা থাকার কথা নয়। পরবর্তী সময়ে নবাব সলিমুল্লাহকে দেখতে পাওয়া যায় হাজী মুহসিনের স্মরণে বক্তৃতা দিতে। সময়ের ও স্থানের বিবেচনায় এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে সে সময়ে এই নবাব পরিবার হাজী মুহাম্মদ মহসিনের দান ও জ্ঞানের অনুরাগের বিষয়টিও তাদেরকে হয়ত এমন বৈশিষ্টগুলো অর্জনের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। খাজা আব্দুল্লাহর উত্তরসূরী তথা তাঁর নাতি খাজা আলীমুল্লাহও পারিবারিক পরিবেশে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন। মজার ব্যাপার খাজা পরিবারের এ সদস্যর শিক্ষা গ্রহণের রীতির সাথেও মিল আছে হাজী মুহাম্মাদ মহসীনের সাথে। নওয়াব পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খাজা আলীমুল্লাহ প্রাচীন দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর শিক্ষক ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত সুফী শাহ ফুরাকী। ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে জ্ঞান হচ্ছে দ্বীন বোঝার চাবিকাঠি, দুনিয়া বোঝারও চাবিকাঠি, এমনকি যে আখিরাতে সকল মানুষ প্রত্যাবর্তন করবে সেই আখিরাত বোঝারও চাবিকাঠি। কুরআনে জ্ঞান শব্দটি এসেছে ৭৭৯ বার! তার মানে হলো, গড়ে প্রতি সুরায় ইলম বা জ্ঞান শব্দটি এসেছে প্রায় সাতবার। কুরআনে আরও অসংখ্য শব্দ রয়েছে যেগুলো জ্ঞান বোঝায় বা জ্ঞান নির্দেশ করে, যদিও তা ইলম শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়নি। এমন শব্দগুলো এসেছে অসংখ্যবার। এর মধ্যে রয়েছে- ইয়াকিন (দৃঢ়বিশ্বাস), হুদা (পথনির্দেশ), আকল (বুদ্ধি, বিবেক), ফিকর (চিন্তা), নযর (দর্শন), হিকমাহ (প্রজ্ঞা), ফিকহ (উপলব্ধি), বুরহান (যুক্তি), দলিল (প্রমাণ), হুজ্জাহ (যুক্তি, প্রমাণ), আয়াত (নিদর্শন), বাইয়িনাহ (প্রমাণ, সাক্ষ্য), এবং অন্যান্য সমার্থবোধক শব্দ, যেগুলো জ্ঞান বোঝায় এবং জ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর রাসুল সা. সুন্নাহে (হাদিসসমূহে) ইলম শব্দটি কতবার এসেছে তা গণনা করা দুঃসাধ্য (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ৩২২-৩২৩)। বদরে যে সকল মুশরিক মুসলিমদের হাতে বন্দি ছিল। মুহাম্মাদ সা. বন্দিদের শর্ত দিয়েছিলেন যে- কেউ মদিনার দশজন নারী-পুরুষকে পড়া ও লেখা শেখালে মুক্তি পেয়ে যাবে। এমন চিন্তা সে সময়ে পৃথিবীর কেউ আদৌ কল্পনা করতে পারেনি, এমনকি তার পরের কয়েক শতাব্দিতেও তা ভাবেনি, এটি ইসলামি সভ্যতার সৌন্দার্য। রাসুল সা. এর ওফাতের পর এ জাতীয় জ্ঞান-আন্দোলন অব্যাহত ছিলো। 'ইসলাম' জাতীয় জ্ঞান-আন্দোলনে ৩টি মাত্রা যোগ করেছিলো। ইসলামই এগুলোর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এর মধ্যে আছে গ্রন্থাগার, জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত গণগ্রন্থাগার। সেখানে সবাই বিনামূল্যে পড়াশোনা করতেন, বিভিন্ন পান্ডুলিপি থেকে যা খুশি অনুলিপি করে নিতেন। ইসলামি বিশ্বের সব বড় শহরেই এসব গ্রন্থাগার ছিলো। জ্ঞানের আসর বসত, কোনো আসর ছিলো তাফসিরুল কুরআনের, কোনোটা ফিকহের মজলিস, অন্যটা নবীজির হাদিসের মজলিস, চতুর্থটা আকিদার মজলিস, পঞ্চমটা চিকিৎসাবিদ্যার মজলিস। জ্ঞানের জন্য ব্যয় করা সদকাও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বলে বিবেচিত হতো। এমনকি তারা তালিবুল ইলম ও শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থাগার নির্মাণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য বহু সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন। এভাবে জ্ঞানের জন্য ব্যয় করা কেবল বিদ্যার্থীদের জন্য নয়, অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষদের জন্যও কল্যানের দ্বাররূপে উন্মোচিত হয় (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬)। মসজিদের জ্ঞানচর্চার আসরগুলো বর্তমান যুগের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সমপর্যায়ের ছিল। মসজিদের হালকাগুলোতে শিক্ষাদানে নারীদের যে ভূমিকা ও অবদান তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রথম যে মসজিদটি মাদরাসায় রূপান্তরিত করা হয় তা হলো জামে আল-আযহার। ৩৭৮ হিজরিতে এটিকে মাদরাসায় রূপ দেওয়া হয়। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির উপর এ সকল মাদরাসার ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনী নেতৃবৃন্দ, আলেম-উলামা, ব্যবসায়ী, আমির-উমারা ও বাদশাহ-উজিরদের ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে এসব মাদরাসা পরিচালিত হতো। গজনি ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সুলতান ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ নিজের জন্য কোনো ঘরও নির্মাণ করেননি, কিন্তু তিনি মাদরাসা-নির্মাণ ও সাহায্য-সহযোগিতায় সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন (ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ.১২, পৃ.১৫৭ থেকে সারজানি, ২০০৯ উদ্ধৃত করেছেন)। মুসলিম গোত্রগুলোই এসব মাদরাসার অর্থায়ন করত। তাদের ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশের কিয়দংশ এসব মাদরাসার জন্য নির্ধারিত ছিল। মাদরাসার সুরক্ষা ও খরচাদিও জন্য তারা মালিকানাধীন অনেক সম্পত্তি ওয়াকফও করে দিয়েছিলো (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ৫৪)।

গ্রন্থপ্রেম, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান এর সাথে শুরু থেকে সম্পৃক্ত ছিল মুসলিমরা। জ্ঞানচর্চায় মুসলিমদের অনেক বেশি অবদান আছে। যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের বিকাশে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিমরা একাডেমিক গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, মাদরাসার গ্রন্থাগার, মসজিদ গ্রন্থাগার তৈরি করতেন। এসব গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের জন্য এসব গ্রন্থাগারের নামে বিপুল পরিমান ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ছিল। রাষ্ট্র গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্টভাবে ওয়াকফ করত। ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষেরাও গ্রন্থাগারের জন্য ওয়াকফ করেছেন। এসব ওয়াকফ থেকেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হতো (সারজানি, ২০০৯, পৃ.৬৮)। জ্ঞানের আধুনিকায়ন, এর প্রচার, প্রসারে খাজা পরিবারকেও এগিয়ে আসতে দেখি। তারা নিজেরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা বিস্তার করাই ছিল ঢাকার নওয়াবদের শিক্ষাদর্শন। এজন্য একদিকে তাঁরা যেমন মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্যদিকে স্কুল-কলেজ স্থাপনেও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। জনশিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আবদুল গনি (১৮৩০-১৮৯৬) প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন (ঢাকা প্রকাশ, ১৮৯৬, দানের তালিকা উদ্ধৃত করেছেন, আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব আবদুল গনির শিক্ষা বিষয়ক অবদানের কথা বলতে গিয়ে লোকনাথ ঘোষ লিখেছেন "His contribution towards the extention of education in the Districts of Dacca, Mymensing and Bakergonj have been munifieient." (ঘোষ, ১৮৮১, পৃ.২৯০)। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও পাঠ্যভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নর্থব্রুক হলে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনে নওয়াব আবদুল গনি সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি উক্ত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় প্রায় সাত শতাধিক বই দান করেন (ঢাকা প্রকাশ- ১লা এপ্রিল ১৮৮২ পৃঃ ৩১ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। খাঁজা আবদুল গনি ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ঢাকা নিউজ (এপ্রিল ১৮৫৬) এর একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন (কেদারনাথ রায়, ১৯৯৭, পৃঃ ৭৪)। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বিনা খরচে বিদ্যা-শিক্ষা দানের জন্য তিনি কুমারটুলীতে একটি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি নওয়াব সলিমুল্লাহর আমল পর্যন্ত চালু ছিলো (ঢাকা প্রকাশ- ৯জুলাই ১৮৬৩ পৃঃ ১৯৬ এবং ২৭ জানুয়ারি ১৯০৭ পৃঃ৩ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহর প্রচেষ্টা ছিল প্রানান্তকর। তিনি নিজে যেমন একজন বিদ্বান ও উঁচুদরের সাহিত্যিক ছিলেন, উর্দূ-ফারসী ভাষায় তাঁর যেমন অগাধ পান্ডিত্য ছিল, তেমনি ইংরেজি ভাষায়ও তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। প্রচলিত আছে যে তিনি ইংরেজি ভাষা এতই ভাল জানতেন যে, আড়াল থেকে তাঁর কথা শুনে মনে হত কোন উচ্চশ্রেণির ইংরেজ সাহেব কথা বলছেন (ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ এবং মোসলেম ক্রনিকেল, ২১ ডিসেম্বর ১৯০১ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ থেকে আলমগীর, ২০১৪ উদ্ধৃত করেছেন)। নওয়াব আবদুল গণির প্রতিষ্ঠিত ফ্রি হাই স্কুলের ছাত্রদের পড়াশোনার উন্নয়নের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে প্রতি সোমবার উক্ত স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের পড়াশুনা পরীক্ষা করতেন। ঢাকা মাদ্রাসার উন্নয়নে নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রচুর অর্থদান করেন। উক্ত মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে নওয়াব আহসানুল্লাহ এর প্রতিটি কর্মকান্ডে স্বয়ং উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন (নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডায়েরী, ১৮৭৪ দ্রঃ আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত থেকে আলমগীর, ২০১৪ উদ্ধৃত করেছেন)। ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল নির্মাণার্থে নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রয়োজনীয় অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করায় তিনি উক্ত অর্থ না দিতে পারায় তাঁর পুত্র সলিমুল্লাহ ১৯০২ সালে এজন্য ১লক্ষ ১২ হাজার টাকা সরকারের হাতে প্রদান করেন (ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃ.৪ থেকে আলমগীর, ২০১৪ উদ্ধৃত করেছেন)। এ শিক্ষা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্মজীবনের শুরুতেই গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য ঢাকার মুসলিম মহল্লাসমূহে নৈশ স্কুল স্থাপন করেন (তৈফুর, ১৯৫২, পৃ. ৩২৮)। অনাথ আশ্রয়হীন ছেলেমেয়েদের লালন-পালন করার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৯ সালে যে এতিমখানাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে আশ্রয়প্রাপ্ত এতিমদেরকেও তিনি নিজ ব্যয়ে লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করেন (পুরনো

দলীল, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত সেখান থেকে আলমগীর, ২০১৪ উদ্ধৃত করেছেন)। স্যার সলিমুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো- দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য প্রাইমারি অথবা মধ্য বাংলা স্কুল পর্যন্ত শিক্ষাই যথেষ্ট। তাদেকে পেশাগত শিক্ষা যেমন উন্নত ধরনের কৃষিকাজ শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাতে তাঁরা আরও অধিক ফসল ফলাতে পারে (ঢাকা প্রকাশ, ১২ এপ্রিল ১৯১৪ পৃঃ ৩ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ এমন একজন ব্যক্তি যিনি দেশ ও জাতির তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে গতানুগতিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার চেয়ে যুগোপযোগী আধুনিক ও কারিগড়ি শিক্ষা প্রসারের পক্ষপাতি ছিলেন (প্রসিডিংস অব দ্যা ফার্স্ট প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম, ১৯০৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আব্দুল্লাহ, ১৯৮৬)। তিনি আরও বলতেন, আজকাল বহু সংখ্যক সার্টিফিকেটধারী ব্যাক্তি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা না থাকায় চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। বর্তমানে স্কুল-কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রদের দৈনন্দিন ও বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। ছাত্ররা রাত দুপুর পর্যন্ত বাতির তেল পুড়িয়ে রোম-গ্রীসের যেসব ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য চষে বেড়ায়, বাস্তব জীবনে তা তাদের কোন কাজেই আসেনি। অন্যদিকে যদি তাঁরা নথিপত্র লেখা কিংবা কারিগরি জ্ঞান অর্জন করতে পারত, তবে চাকরির জন্য প্রভাবশালীদের দ্বারে দ্বারে না ঘুরে জীবিকা অর্জনের একটা পথ পেয়ে যেত। উচ্চ শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে নওয়াব সলিমুল্লাহ বলতেন, তাঁদেরকে ইসলামী বিষয়াদি ও ইসলামী দর্শন অধ্যয়ন করা উচিত (সভাপতির ভাষণ, অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স, অমৃতসর ১৯০৮ পৃঃ৪-১০ মূল উর্দু থেকে বাংলায় অনূদিত, আবদুল্লাহ, ১৯৮৬ উদ্ধৃত করেছেন)। পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি তথা নওয়াব সলিমুল্লাহর শিক্ষাক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল, এদেশে রিফরমড মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করা। এ সমিতির নেতৃবৃন্দ জানতেন মুসলিমরা ধর্মবিবর্জিত শিক্ষার প্রতি বিরাগভাজন। তাই তাঁরা নিছক লোকায়ত শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁরা ধর্ম শিক্ষা ও লোকায়ত শিক্ষার একটা সুষ্ঠু সমন্বয় চেয়েছিলেন। এজন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ আয়োজিত ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনেই তাঁরা 'মিডল মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন (প্রসিডিংস অব দ্যা ফার্স্ট প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম, ১৯০৬ রেজুলেসন ১০ পৃঃ ২৫ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আব্দুল্লাহ, ১৯৮৬)। মিডল মাদরাসায় আরবী, ফারসী উর্দু তথা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি, ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহ মাদরাসা সংস্কারের পাশাপাশি পাশ্চাত্য বৈশিষ্ট্যে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সেখানে আরবী, ফারসী, উর্দু এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন, যাতে রিফরমড মাদ্রাসা পাস ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেন (রহিম, ১৯৮১, পৃঃ৯)। ১৯০৬ সালের ১৪জুন হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির ভাষণে নওয়াব সলিমুল্লাহ বলেছিলেন, 'আমাদের অনেক ইবাদতখানা ও মসজিদ আছে। বড় বড় শহরে প্রতি আধা মাইলে একটি করে মসজিদ আছে যা আমাদের ধর্মকর্মের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের এখন জরুরি প্রয়োজন হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী এবং তাতে ছোট বড় সবাই হবে লাভবান। কেউ যদি এখন ভালো কাজ করতে চায় তাহলে তাকে এখন শিক্ষার জন্য সাহায্য করা উচিত। আমাদের সমাজে পুরনো ধ্যান ধারণার মানুষ এমন কাজে হাজার টাকা দান করেন, যাতে শিক্ষারত দরিদ্রের কোনো কাজে আসে না। সমাজের প্রয়োজনে একটু চিন্তা করে তাঁদের এ ভুল শুধরানো উচিত (নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ, ১৪ জুন ১৯১৪ মোসলেম ইনস্টিটিউট হল, কলকাতা, উদ্ধৃত করেছেন আবদুল্লাহ, ১৯৮৬)। নারী শিক্ষার বিষয়ে তিনি একজন প্রবক্তা ছিলেন, তিনি বলেছেন ...শিশুরা তাদের মায়ের কাছেই প্রথম শিক্ষা পায় এবং মায়েরা সহজেই তাদের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। আমরা আশা করব জনগণ সরকারের দেয়া এই নারী শিক্ষার সুযোগটি গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের স্ত্রী ও কন্যাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে সক্ষম হবেন (প্রসিডিংস অব দি লেজিসলেটিব কাউন্সি অব ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম, ৬ এপ্রিল ১৯০৮, পার্ট-৬ পৃ. ৭১ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আব্দুল্লাহ, ১৯৮৬)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

মুসলমানদের জন্য পৃথক হল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মূলত মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে ইসলাম ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। নওয়াব সলিমুল্লাহও ইহাই চেয়েছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের পিতামাতা যেমন তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তেমনি উক্ত হলে মুসলমান অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণে তারা সেরূপ পরিবেশেই শিক্ষা লাভ করতেন (আলমগীর, ২০১৪, পৃঃ ২১২)। ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকালে নওয়াব আবদুল গনি এ্যাংলো এ্যারাবিক ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথাই চিন্তা করেছিলেন। যার ফলে উক্ত মাদ্রাসায় অতি সহজেই ইংরেজি বিভাগ খোলা সম্ভব হয়েছিল (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ১৯১)। ঢাকায় এ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী আবদুল্লাহ ও তাঁর পুত্র পীর খাজা আহসানুল্লাহ এবং খাজা হাফিজুল্লাহ উভয়েই বিজ্ঞ আলেম ছিলেন (তায়েশ, ১৯৮৫, পৃ.১৮১)। তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য গৃহশিক্ষক রেখেপড়াশুনার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এক্ষেত্রে তাঁদের জন্য একদিকে যেমন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরবী-ফারসী জানা উস্তাদ থাকত, অন্যদিকে তেমন ইংরেজি ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য ইউরোপীয় শিক্ষকও নিয়োগ করা হত (আব্দুল্লাহ, ১৯৮৬ পৃ. ৪৭)। নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ ও নওয়াব সলিমুল্লাহ অনুরূপ গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করেছিলেন। তাঁদের সমসাময়িককালে খাজা পরিবারের অন্যান্য সন্তানেরাও শ্রেণিমত এস্টেট থেকে দেয়া ভাতায় তাঁদের গৃহশিক্ষকের কাছে বিদ্যার্জন করত কিংবা নওয়াবদের পারিবারিক মক্তবে পড়ত। নওয়াব সলিমুল্লাহ খাজা পরিবারের গৃহশিক্ষক প্রথা অতিক্রম করে তাঁর পুত্রদের ইংরেজি স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ১৯১)। এটি সুদুরপ্রসারী যে ভালো ফল বয়ে আনেনি তা বলা যায়। নওয়াব সলিমুল্লাহর পরবর্তী বংশধারা তাঁর জানান দেয়। গৃহশিক্ষক প্রথা গুরুমুখী শিক্ষার বিষয়টি যুগ যুগ ধরে জ্ঞানী, গুণি মানুষ তৈরি করতে বিশেষ করে ইসলামী সভ্যতায় ফলপ্রদ বলে ইতিহাসে প্রামাণিকতা রয়েছে। যাদেরকে গৃহশিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হতো তাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি সৃজনশীল ও সৃষ্টিশীল কাজে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নওয়াব আবদুল গনি ফ্রি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৮৩ সালে। নওয়াব আবদুল গনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মাঝে ঘটা করে অনুষ্ঠান করে ভাল ফলাফলকৃত ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করতেন। আধুনিক ও জনশিক্ষা বিস্তারে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতা ও পিতামহলের চেয়েও বেশি অগ্রজ ছিলেন (আলমগীর, ২০১৪, পৃ.২১৪)। নওয়াব আবদুল লতিফ তৎকালীন বাংলার ছোটলাট স্যার জজ ক্যাম্পবেলকে বোঝাতে সামর্থ্য হয়েছিলেন যে, হাজী মুহাম্মাদ মহসীনের ইচ্ছানুযায়ী মোহসীন ফান্ডের টাকা মুসলিমদের জন্য ব্যয় হচ্ছে না। এর ফলে ছোটলাটের সুপারিশে ১৮৭৩ সালে ভারত সরকার হুগলী কলেজের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ দেন। এছাড়া মোহসীন ফান্ড থেকে যে ৫৫ হাজার টাকা উক্ত কলেজের জন্য এতদিন ব্যয় হচ্ছিল তা শুধু মুসলিমদের শিক্ষার জন্য ব্যয়ের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। উক্ত টাকায় কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার উন্নতি এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয় (রহিম, ১৯৮৯, পৃ. ১৪৮)। ১৮৭৩ সালে বাংলা সরকার ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য মোহসীন ফান্ড থেকে ১০হাজার টাকা ধার্য করে রাখে। উক্ত মাদ্রাসা স্থাপনে জমি ক্রয়ের জন্য বদান্যবর নওয়াব আবদুল গনি ৫,৫০০ টাকা দান করেন (আবদুল্লাহ, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯৪)।

ঢাকার সার্ভে স্কুলকে বিভাগীয় কমিশনার যখন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল করার পরিকল্পনা করলেন। এর ব্যয় নির্ধারিত হলো ১লাখ ৩০ হাজার টাকা (ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ থেকে উদ্বৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। আহসানুল্লাহ তখন এর সমুদয় টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন কিন্তু তখন তিনি মারা গেলে তার পুত্র সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পরিবারের সদস্যার তার এই ওয়াদা পুরনে এগিয়ে আসেন। তারা ১৯০১ সালে এ জন্য ১ লাখ ১২হাজার টাকা সরকারের হাতে অর্পন করেন (পুরনো নথি, ডি-১৮ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪) তখন এই স্কুলের নাম করণের সিদ্ধান্ত হয় আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪) নওয়াবদের দানে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি সময়ের পরিক্রমায় বুয়েট-(বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনলজি) হয়ে ওঠে। অথচ এর প্রতিষ্ঠাদাতার অবদানকে নাম

পরিবর্তনের মাধ্যমে আড়াল করে দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষা উদ্যোক্তাদের এ পথে হাটতে অনুৎসাহিত করবে। এটি দাতাদের অবমূল্যায়েন শামিল বলে অভিযোগ করলেও হয়তো তা বেশি বলা হবে না। এর পাশাপাশি মাদারীপুর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায়, নেত্রকোনা মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন, জামুর্কী আবদুল গণি হাইস্কুল, বিক্রমপুর দিঘিরপাড় সলিমিয়া উন্নয়ন মাদরাসা, নওয়াব হবিবুল্লাহ স্কুল প্রতিষ্ঠা, কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা, নওয়াব সলিমুল্লাহ কলেজ উন্নয়ন এগুলো নবাব পরিবারের উদ্যোগ, অর্থযোগানে নির্মিত হয়। পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় এতিম ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দান করে উৎপাদনশীল কর্মী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সালে সলিমুল্লাহ তৈরি করেছিলেন একটি এতিমখানা। এর অন্যতম কারণ ছিলো নওয়াব সলিমুল্লাহর এক শিশুকন্যা অকালে মৃত্যুবরণ করে। ১৯১৩ সালে লর্ড কারমাইকেল এতিমখানাটি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়ে এক হাজার টাকা দান করেন। এরপর স্থায়ীভাবে এতিমখানা গৃহনির্মাণের জন্য আজিমপুরে গোরেশহীদ মসজিদ সংলগ্ন একখন্ড খাসমহল জমি পত্তন নেয়া হয়। সেখানে দু বছরে এতিমখানা নির্মাণের আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হয়। নওয়াব বাহাদুর এই নির্মাণ কাজের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন (মাসিক মোহাম্মদী, ৮বর্ষ ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪১ বাংলা পৃ. ১১০ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর (১৯১৫) পর তাঁর পুত্র খাজা হাবিবুল্লাহ নওয়াবী পদে আসীন হয়ে পিতার স্মৃতি ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এতিমখানাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৬ সালে লালবাগের ভাড়া বাড়ি থেকে এতিমখানাটি আজিমপুরের বর্তমান স্থানে স্থানান্তরের কাজ পুরোপুরি শেষ করেন (মোঃ আবদুর রউফ স্মরণিকা, স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানা, ঢাকা থেকে উদ্ধৃত করেছেন আবদুল্লাহ, ১৯৮৬)। ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠানটির পূর্ব নাম বদলিয়ে প্রতিষ্ঠাতার নামে এর নামকরণ করা হয় 'স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা (হোসেন, ১৯৯৫ পৃ. ৪৬২)। নওয়াব হবিবুল্লাহর আমলে আজিমপুরে এতিমখানার প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী জমিসমূহ সরকারের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অধিগ্রহণ করা হয়। চৌধূরী ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকীর অবিরাম পরিশ্রম ও ত্যাগের ফলে এতিমখানাটি পূর্ববাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ও উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান এতিমখানায় রূপান্তর ঘটে। ২৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই এতিমখানাটিতে বর্তমানে যেসব দালানকোঠা দেখা যায়, সেগুলোর অধিকাংশই তাঁর আমলে তৈরি (মোঃ আবদুর রউফ স্মরণিকা, স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানা, ঢাকা থেকে উদ্ধৃত করেছেন আবদুল্লাহ, ১৯৮৬)। সেখানে দর্জি, কামার, বয়ন, মিস্ত্রী, দফতরী ও বাগানের কাজ শিক্ষা দেয়া হত, মেধাবী ছাত্রদের সাধারণ ও কারিগরি বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো (মাসিক মহম্মদি পত্রিকা থেকে আলমগীর উদ্ধৃত করেছেন, ২০১৪)। জ্ঞান ও দানে নবাবদের অংশগ্রহণ নগরবাসীদের নিকট তাদের আস্থাভাজন ও আশ্রয়স্থল ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

নওয়াব আবদুল গনির পুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহকেও ঢাকাবাসী তাঁদের অভিভাবক ও আশ্রয়স্থল মনে করত। জনকল্যাণে তিনি অজস্র অর্থদান করেছেন। ১৮৯৮ সালে প্লেগরোগের আতঙ্কে ঢাকা শহরের লোকেরা যখন দিশেহারা হয়ে শহর ছেড়ে গ্রামেগঞ্জে ছুটে পালাচ্ছিল তখন নওয়াব আহসানুল্লাহ লক্ষ টাকা দান করে শহরবাসীকে ঐ মহামারী থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। এবং প্রয়োজন হলে আরও ১লক্ষ টাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন (ঢাকা প্রকাশ, ৮ মে ১৮৯৮ পৃঃ ৬-৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের উদারতা আরও পরীলক্ষিত হয় নর্থব্রুক হল ও লাইব্রেরি নির্মাণে, সেখানে গণ্যমান্যরা ৮ হাজার টাকা দেওয়ার ওয়াদা করেন এর মধ্যে নওয়াব খাজা আবদুল গনি ১হাজার ও তাঁর পুত্র আহসানুল্লাহ ১ হাজার টাকা প্রদান করেন (ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জুলাই ও ৩০ আগস্ট, ১৮৭৪ এর পৃ. ২৮৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অর্থ ও বই পুস্তক দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম খাজা আবদুল গনি ও ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র (মৃত: ১৯০১) এর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ১৮৮২ সালে খাজা আবদুল গনি প্রায় ৭শত মূল্যবান গ্রন্থ এই লাইব্রেরিতে দান করেন নওয়াব আহসানুল্লাহও উক্ত গ্রন্থাগারে অনেকগুলো বই দান করেন (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ৯৯)। ১৮৬৬ সালে ঢাকার পূর্ব দরজায় নওয়াব আবদুল গনি একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। উক্ত লঙ্গরখানায়

২০জন পুরুষ ১৬ জন মহিলা এবং ৬জন শিশু ছিল। এদের অধিকাংশই ছিলো অন্ধ অথবা খোঁড়া। তাদের থাকার জন্য কক্ষাদিসহ বিনামূল্যে খাবার ও পোশাক দেয়া হত এবং একজন দেশীয় ডাক্তার এদের স্বাস্থ্য সেবা দিতেন। এখানে ভর্তির শর্ত ছিল, সে আর ভিক্ষা করতে পারবে না। উক্ত লঙ্গরখানাটি নওয়াব আহসানুল্লহার সময়েও ছিল (ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭০ পৃঃ৪৩৬-৩৭ এবং হান্টার, ভল্যুম ৫, পৃঃ ১৮৯ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আবদুল্লাহ, ১৯৮৬)। বাকল্যান্ড বাঁধ ও সংলগ্ন ঘাট নির্মাণে ঢাকার নওয়াব মোট ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন (নওয়াব আহসানুল্লাহর তারিখে খান্দান, পৃঃ ২৪৪-২৪৫ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব আবদুল গনি কলকাতা থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর পুত্র আহসানুল্লাহসহ বরিশালের জমিদারীতে উপস্থিত হোন। বরিশালের প্রজাগণ তাঁকে সে সময় সাড়ে ত্রিশ হাজার টাকা নজরানা দেয়। টাকাগুলো তিনি ঐ এলাকায় কয়েক স্থানে পুকুর খনন ও মসজিদ নির্মাণে দান করেন। এ ছাড়া ঐ সময় তিনি বরিশাল শহরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরির জন্য আরও পাঁচ হাজার টাকা দান করেন (ঢাকা প্রকাশ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ পৃঃ৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব আবদুল গনি কেবল দেশেই নয় বরং বিদেশেও দান করেছেন প্রচুর। তিনি ইরান, লাঙ্কশায়ার, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও ঝড়, ভূমিকম্প পীড়িতদের সহায়তায় দান করেছেন। রুশ তুরস্ক যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের বিধবাদের জন্য তিনি অর্থ সাহায্য পাঠান, খলিফা হারুনার রশিদের বেগম জোবায়দা কর্তৃক মক্কায় নির্মিত খাল 'নহরে জোবায়দা' সংস্কারে তিনি ৪০ হাজার টাকা দেন (নওয়াব আহসানুল্লাহর তারিখে খান্দান, পৃঃ ২৪৪-২৪৫ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আলমগীর, ২০১৪)। তিনি মক্কায় হারাম শরীফ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর এস্টেট থেকে বার্ষিক বড় অংকের চাঁদা পাঠানো চালু করেন, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অব্যহত ছিলো (খাজা লতিফুল্লাহ, দি ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার, করাচি ১লা এপ্রিল থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে আরব, রোম, সিরিয়া ও ইউরোপে আবদুল গনির বদান্যতা এবং বুদ্ধির প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে নওয়াব আবদুল গনির মত এরূপ আর কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির জন্ম হয়নি, যাঁর দ্বারা সারা বাংলার মান-মর্যাদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে (তায়েশ, ২০১৬ পৃ. ১১০)। এর পাশাপাশি নওয়াব আবদুল গনি ধনী-গরীব নির্বিশেষে বহু মানুষকে প্রচুর পরিমানে অর্থ ঋণ দিয়েছিলেন। ১৮৬৮ সালে পুত্র আসানুল্লাহকে জমিদারী পরিচালনার ভার দেয়ার পর নওয়াব আবদুল গনি এই ভেবে শঙ্কিত হন যে, আহসানুল্লাহ হয়ত ঐ সব ঋণগ্রহীতাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন না। এ ধারণা ও চিন্তা থেকে তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি খাতকদের নেয়া ঋণগুলো মাফ করে দেন এবং ঋণ সংক্রান্ত কাগজপত্র সব ছিঁড়ে ফেলেন। দানের জন্য খাজা পরিবারে পূর্ব থেকেই একটি পৃথক তহবিল ছিল। নওয়াব আবদুল গনির সময় ঐ তহবিল থেকে ১০গুণেরও বেশি দান খয়রাত করা হত। উক্ত তহবিল থেকে নওয়াবরা দুস্থ ও দরিদ্রদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতেন। তহবিলটি নওয়াব হাবিবুল্লাহর সময় পর্যন্তও কম-বেশি অটুট ছিল (নওয়াব আহসানুল্লাহ এর তারিখে খান্দান থেকে উদ্ধৃত করেছেন আব্দুল্লাহ, ১৯৮৬)। নওয়াব আহসানুল্লাহ দানশীলতা ও আতিথেয়তায় তাঁর পিতার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হোন। তিনি সে যুগে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ অকাতরে দান করেছিলেন (ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ পৃঃ৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর পরলোকগত স্ত্রীর স্মরণে বরিশালের পটুয়াখালীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মান করেন। এজন্য তিনি বরিশালের মহকুমা প্রশাসকের হাতে ৮হাজার টাকা দেন (ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুলাই ১৯০০ পৃঃ৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। ঢাকায় এমন কোন মসজিদ দরগাহ কিংবা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান নেই যাতে নওয়াব আহসানুল্লাহর দানের ছোঁয়া লাগেনি (তৈফুর, ১৯৫২, পৃ. ৩২৭)। খাজা আলীমুল্লাহর সময় থেকেই ঢাকার নওয়াব এস্টেট থেকে বেশ কিছু সম্পত্তি আল্লাহর নামে ওয়াকফ করা ছিল। ঐসব সম্পত্তির আয় থেকে গরীব-দৃঃখীদের দান করাসহ উল্লেখিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হত (ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ডিসেম্বর ১৯০০ পৃ.৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব আবদুল গনির সময় এই সম্পত্তির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। উক্ত ওয়াকফ ফান্ডে বহু লক্ষ টাকা

আয় হত। এজন্য ঢাকার নওয়াবদের পক্ষে এ জাতীয় সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করাটাও বেশ সহজ ছিল। সর্বোপরি এ জাতীয় জনকল্যাণকর কাজে তাঁদের ছিল উদার মানসিকতা (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ১৭২)। নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ব্যাংকের হিসেব ও কোষাগারে জমা অর্থের পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষাধিক টাকা। এছাড়া সোনা-দানা, মণি-মুক্তাগুলো তো ছিলই। কিন্তু অকাতরে দানকাজ ও রাজনীতি করতে গিয়ে ৪-৫ বছরের মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ গচ্ছিত ধন-সম্পদ শেষ করে ঋণ করতে শুরু করেন। ১৯০৭ সালে তাঁর ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ লাখ টাকা। তিনি তাঁর রাজনীতি করার কারণও ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- আমার দাদা নওয়াব স্যার আব্দুল গনি সি.এস.আই.ই এবং আমার পিতা নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ কে.সি. আই-ই দুনিয়া জোড়া খ্যাতির অধিকারী এবং দেশ ও জাতীয় প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু, এটা নিহিত ছিল আমার ভাগ্যে, আমি এখন দেখলাম, আমার জাতি ও আমার পাক রসুলের উম্মত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি এটাই সমীচীন মনে করলাম যে, আমি স্বয়ং ধ্বংস হয়েও তাঁদের বাঁচাবো এবং আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি (আব্দুল্লাহ, ১৯৮৬ পৃ. ১৮৭)। ধর্মভীরু সলিমুল্লাহ মদ-নারীর পেছনে কোনো অর্থ অপব্যয় করেননি। জনকল্যাণমূলক কাজে দান-ধ্যান ও রাজনীতিতে অর্থ ব্যয়ের কারণেই তিনি ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ১২১)। যেমনটি তাঁর পিতা সম্পর্কেও ঢাকা প্রকাশ লিখেছিলো সমসাময়িক ধনীদের মতন নবাব রমণীদের পিছে অর্থ খরচ করেননি। স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কখনো মদ স্পর্শ করেননি (ঢাকা প্রকাশ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, ১৯৮৬)। আর্থিক টানাপোড়নের কারণে ১৯০৭ সালে নওয়াবের জন্য ধার্যকৃত মাসিক ভাতা মাত্র ৫০৫০ টাকার বেশি খরচ করতে দিতে তাঁর শরীকগণ আপত্তি তোলেন (ঢাকা প্রকাশ, ৩১ মার্চ ১৯০৭ পৃঃ৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আলমগীর, ২০১৪)। কাজেই এরপর থেকে এস্টেটের ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় থেকে দান কাজে নির্ধারিত ব্যয় করা ছাড়া নওয়াবের পক্ষে অধিক কোন দান করার মত কোনো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। ১৯০৭ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর নিজের অংশের সমুদয় সম্পত্তি সরকারের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিতে বাধ্য হন (১৯৫৯ সালে লেখা চীফ ম্যানেজারের রিপোর্ট, পুরনো দলিলপত্র পৃ. ৩-৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। এদেশের শত শত অনাথ ও দীন-দুঃখী নওয়াব এস্টেটের স্থায়ী দানের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঐসব অসহায় মানুষের দুঃসহ জীবনযাপনের কথা ভেবে স্থানীয় পত্রিকাগুলো ১৯০৭ সালে আফসোস করে খবর প্রকাশ করেছিলো (ঢাকা প্রকাশ, ২৮জুলাই ১৯০৭ পৃঃ৩ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আলমগীর, ২০১৪)।

ইসলামী সভ্যতায় অসুস্থ মানুষের সেবা, তাদের যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য রাসূল সা. এর সময় থেকে দেখা যায়। মুহাম্মাদ সা. অসুস্থকে দেখতে তার বাড়িতে বা হাসপাতালে যাওয়াকে মুসলমানদের একটি অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছেন (বুখারি, কিতাব: আল-জানায়িয, বাব: আল-আমরু বিত্তিবায়িল জানায়িব, হাদিস নং ১১৮৩)। ইসলামী সভ্যতায় স্বাস্থ্য-সংস্থাগুলো স্বাস্থ্যসেবায়, রোগীদের সেবা শুশ্রূশায়, বিশেষ করে দরিদ্র ও নিঃসহায় রোগীদের যত্ন ও সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ সংস্থাগুলো স্বাস্থ্য-সেবাকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। বিশেষায়িত স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ প্রচুর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান রোগীদের চিকিৎসায় তাদের আপ্যায়ন ও যত্ন-আত্তিতে সার্বক্ষণিক সেবা দিয়েছে। বিশ্বসভ্যতায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান হলো বিশ্বের প্রথমবারের মতো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বরং অন্যান্য জাতি থেকে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। নয়শ বছরেরও বেশি সময় পরে প্যারিসে প্রথম ইউরোপীয় হাসপাতাল তৈরি হয়েছিলো (সারজানি, ২০০৯, পৃষ্ঠা. ২৮৪-২৮৫)। ইসলামি হাসপাতালগুলোর অভ্যন্তরে থাকত বড় বড় গ্রন্থাগার, সেগুলোতে থাকত অসংখ্য বই। কায়রোতে অবস্থিত ইবনে তুলুন হাসপাতালের গ্রন্থাগারে ছিলো এক লাখেরও বেশি গ্রন্থ। হাসপাতালের পার্শ্ববর্তী জমিগুলোতে ওষুধি বড় বড় বাগান ছিল। এসব বাগানে ওষুধি বৃক্ষ ও তৃণলতার চাষ হতো। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের জন্য এসব বাগান তৈরি করা হতো। বাগদাদে আল আদুদি

হাসপাতালে প্রতিষ্ঠাকালে ছিলেন ২৪জন চিকিৎসক, বিশাল গ্রন্থাগার যুক্ত হয় হাসপাতালটিতে। নানা ধরণের কর্মচারী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের এক বিশাল দল এই হাসপাতালে কাজ করত। চিকিৎসকগণ পালাক্রমে রোগীদের সেবা করতেন। ফলে হাসপাতালে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টাই চিকিৎসক থাকতেন। দামেশকের আননুরি হাসপাতাল প্রায় আটশ বছর রোগীদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং চিকিৎসাসেবা দিয়েছে। আন্দালুসীয় ভূগোলবিদ ও পর্যটক ইবনে জুবায়ের তার ৫৮০ হিজরীর/১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ভ্রমণবৃত্তান্তে এ ব্যাপারে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা অতি চমকপ্রদ। তিনি আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-পল্লি পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটি একটি ছোট শহরের সমান। এই পল্লির মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে একটি বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা। অট্টালিকার চারপাশে রয়েছে বাগান এবং বেশ কিছু ঘর। এ সবকিছুই ছিলো রোগীদের জন্য ওয়াকফকৃত। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সকলের খরচ বহন করা হতো। উম্মাহর ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্র ও নিঃসহায় রোগীদের চিকিৎসার জন্য যেসব সম্পত্তি ওয়াকফ করেছিলেন তা থেকেও আসত খরচের একটি বড় অংশ (মুস্তাফা আস-সিবায়ি এর মিন রাওয়িয়ি হাদারাতিনা এর পৃ. ১০১ থেকে উদ্ধৃতি করেছেন সারজানি, ২০০৯)। মানবিকতার এই তরঙ্গ ইসলামি সভ্যতায় যুগ যুগ ধরে প্রবহমান ছিলো। কারণ এর পেছনে সক্রিয় ছিল মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের উদারচিত্ত ও মুক্তহস্তে দান। এই দান ছিল অবিরাম প্রস্রবনের মতো এবং তা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের জন্যও সহায়ক। এখানে জনকল্যাণমুলক ওয়াকফ ব্যবস্থাপর কথা বোঝাতে চাচ্ছি। অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা, যত্ন ও আপ্যায়ন এবং তাদের সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে ওয়াকফ-ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় থেকেই হাসপাতালগুলোর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হতো। রোগীদের প্রয়োজনীয় খরচ, চিকিৎসকদের বেতন ভাতা, বিছানাপত্র ও খাদ্য ক্রয়, ওষুধি বাগান তৈরি, ওষুধ প্রস্তুতকরণ-সবকিছুর খরচ আসত ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে। এমনকি হাসপাতালে অনুশীলনরত মেডিকেল শিক্ষার্থীদের খরচাদিও মেটাত এ থেকে (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ৩০১)। ইসলামি চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে আরেকটি মানবিক দিক বিবেচনায় রাখা হতো। ইসলামি শরিয়া এ ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছে। তা হলো রোগীর সম্মান রক্ষা করা ও তার লজ্জা হেফাজত করা। ফলে রোগীর ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মসম্মান যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে লক্ষ রেখেই যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হতো। ইসলামি শরিয়ার বিধান অনুযায়ী প্রয়োজন ছাড়া রোগীর ছতর উন্মোচন করা জায়েয নয়। পরীক্ষা বা অস্ত্রোপচার করতে যতটুকু অংশ উন্মোচিত করা প্রয়োজন ততটুকু উন্মোচিত করা যাবে, এর বেশি নয়। বাইরের কারও জন্যে রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারগুলো দেখা জায়েয নয়। সেই সাথে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে রোগীদের অধিকারকে সুরক্ষা দিয়েছে। অর্থ্যাৎ পুরুষ চিকিৎসকের জন্য মহিলা রোগীর চিকিৎসা করার অনুমোদন রয়েছে এবং একইভাবে নারী চিকিৎসকের জন্যও পুরুষ রোগীর চিকিৎসা করার অনুমোদন রয়েছে। এই অনুমোদন তখনই কার্যকর হবে যখন সমলিঙ্গের অভিজ্ঞ চিকিৎসক না পাওয়া যাবে যিনি পূর্ণরূপে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। এমনকি শরিয়া এই অনুমতিও দিয়েছে যে, মুসলিম রোগী অমুসলিম চিকিৎসকের কাছেও চিকিৎসা নিতে পারবে, যখন তার যথার্থ চিকিৎসা করতে পারে এমন মুসলিম ডাক্তার পাওয়া দুস্কর হবে (সারজানি, ২০০৯, পৃ.৩০২-৩০৩)। এমন কাজের ধারা সংযোজন, বিয়োজনের মধ্য দিয়ে এর চর্চা দেখতে পাওয়া যায় ঢাকার নওয়াবগণের মধ্যে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন (আলমগীর, ২০১৪, পৃ.১৫৭)। ঢাকার নওয়াবরা তাদের জমিদারীর এলাকায় প্রায় প্রত্যেকটি কাচারিকে কেন্দ্র করে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন মফস্বল শহর এলাকায় তারা কয়েকটি আধুনিক হাসপাতালও নির্মাণ করেছিলো। দেশের বাইরেও বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে তারা অর্থ সাহায্য পাঠাতেন (পুরনো নথি, ডি-পৃঃ ১৩-১৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব আবদুল গনির সময় থেকে শুরু করে নওয়াব হবিবুল্লাহ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় মিটফোর্ড হাসপতালের নানা উন্নয়ন কাজে তারা প্রভূত অর্থ দান করেছেন। ঐ কাজের মধ্যে ছিল নতুন নতুন ওয়ার্ড নির্মাণ, গৃহ ও ডিসপেনসারী নির্মাণ এবং মৃতদেহ সৎকাজ প্রভৃতি। এছাড়া নওয়াব এস্টেটের ওয়াকফ ফান্ড থেকে প্রতি

বছর মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকত (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ১৫৮)। মহিলাদের পর্দা বজায় রেখে ভালো চিকিৎসা নেয়ার সুবিধার্থে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও লেডি ডাফরিনের ঢাকা আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ লেডি ডাফরিনের নামে ঢাকায় উক্ত মহিলা হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দেন। এ হাসপাতাল নির্মাণের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ একাই ৫০হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে লেডি ঢাফরিন হাসাপাতালটি অর্থাভাবে মিটফোর্ড হাসপাতালের সাথে একীভূত হয়ে যায় (ঢাকা প্রকাশ, ২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৮ পৃঃ৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। পটুয়াখলীতে নওয়াব এস্টেটের পক্ষ থেকে বহু আগেই একটি দাতব্য চিকিৎসালয় চালানো হত। প্রতিমাসে ঐ চিকিৎসালয়ের জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে ৫টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া ছিল। নওয়াব আহসানুল্লাহর তৃতীয় স্ত্রী কামরুন্নেসা বিবি ১৯০০ সালে মারা গেলে তাকে স্মরণীয় করে রাখতে পটুয়াখালীতে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নির্মাণ করেন এবং এর নাম দেন পটুয়াখালী বেগম হাসপাতাল (ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুলাই ১৯০০ পৃঃ৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা পাবার পর তা পরিচালনার জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য দেওয়া হতো। এ ছাড়াও যে কোন সময় হাসপাতালের বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য মোটা অংকের টাকাও দেয়া হত। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, উক্ত হাসপাতালে জন্য ১৯০৩ সালে ১ হাজার টাকা এবং ১৯০৪ সালে ৪ হাজার টাকা নওয়াব এস্টেট থেকে প্রদান করা হয়েছিলো (অর্থদানের তালিকা থেকে উদ্বৃত করেছেন, আলমগীর, ২০১৪)। টাঙ্গাইলের জামুর্কি নামক স্থানে ঢাকার নওয়াবদের বড় ধরনের একটি জমিদারী কাচারী ছিল। উক্ত কাচারী এলাকায় ঢাকার নওয়াবরা একটি মসজিদ, একটি স্কুল ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এই চিকিৎসালয়টিতে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবাদানের ব্যবস্থা ছিল (আলমগীর, ২০১৪, পৃ.১৬৩)। নবাব পরিবারের নওয়াবজাদী আখতার বানু বেগম আহসানুল্লাহর স্মরণে ঢাকা শহরের টিকাটুলিতে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে এর নাম দিয়েছিলেন 'স্যার আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হাসপাতাল'। এ হাসপাতালের জন্য তিনি ১০বিঘারও অধিক ভূসম্পত্তিসহ একটি উপযুক্ত অট্টালিকা দান করেন। তিনি এর পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করতেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (অ্যানুয়াল রিপোর্ট অব দি স্যার আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হসপিটাল, ১৯৩৮ পৃঃ ১-২ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত, দরিদ্র নারী-পুরুষদের চিকিৎসা সেবা দেয়া, বিশেষ করে পর্দানশীন মহিলারা যাতে পর্দা রক্ষা করে তাঁদের রোগব্যাধির চিকিৎসা করাতে পারেন, সেজন্যই মূলত এ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা কারণে ১৯৪০ এর দিকে উক্ত হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে নওয়াবজাদীর মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের সম্পত্তি আত্নীকৃত করা হয় (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ১৬৪)। ইউরোপীয় ওষুধের আমদানী করে নবাবদের ঢাকায় মডেল ফার্মেসীর ব্যাপারটি দেখা যায়। তৎকালীন ঢাকার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ কৈলাস চন্দ্র বন্দোপাধ্যয় নিজে উক্ত ফার্মেসীতে উপস্থিত থাকতেন। তিনি ঔষধের গুণাগুণ বিচার করতেন এবং রোগী ও ক্রেতাদের যথাযথ ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করতেন (ঢাকা প্রকাশ, ১৪ এপ্রিল ১৮৭৮ পৃ. ৬০ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪) স্থানীয় পত্রিকাসমূহে মাঝে-মধ্যেই উক্ত ফার্মেসীর গুণাগুণ সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হতো। প্রতিবছর এ ঔষধালয়টির পক্ষ থেকে সুন্দর সুন্দর ওয়াল ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করা হত (ঢাকা প্রকাশ, ১৪ এপ্রিল ১৮৭৮ পৃঃ ৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)।

নবাবরা সমসাময়িক অবস্থা বিবেচনায় ব্রিটিশদেরকে মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্টতায় কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। খাজা আলীমুল্লাহ প্রথম থেকেই ইউরোপীয় চালচলন শুরু করেন। তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি উপেক্ষা করে কলোনিয়াল ইন্ডিয়ায় উন্নতি সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের অনুশীলন করেও তিনি ইংরেজ শাসক ও কর্মকর্তাদের সাথে সৌহার্য্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন। বাস্তব কারণে তাঁদের সাথে শত্রুতা নয়

বরং সখ্যতা স্থাপনের চেষ্টা করেন (আলমগীর, ২০১৪ পৃ.১৬)। খাজাদের মধ্যে ইউরোপীয় চালচালন শুরু হয় উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে। ১৮৩৫ সালে খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর পুত্র খাজা আবদুল গণি (পরে নওয়াব) কে ঢাকার সদরঘাট কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করেন। তিনি এদেশে আসা খাজাদের চতুর্থ প্রধান ব্যক্তি। তার সময়েই ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। ইংরেজ ও স্থানীয় জমিদারগণ মিলে ১৮৪৬ সালে ঢাকায় প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক স্থাপন করেন (শরিফুদ্দিন, ১৯৯১ পৃ. ১৫০-৫১; মামুন, ২০০৮ পৃ. ১১১-১২)। খাজা আলীমুল্লাহ এতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। খাজা আবদুল গণি শৈশবে স্বগৃহে আরবী-ফারসী শিক্ষা করেন। তিনি অবাধে ইংরেজি পড়তে, লিখতে এবং বলতে পারতেন (সেন, ১৯৯১ পৃ. ১২৮)। নওয়াব আবদুল গনি ইংরেজি শিক্ষা পছন্দ করলেও ইংরেজদের চালচলন ও বেশভূষা অবলম্বন করতেন না। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার ও আনন্দ উৎসবে প্রাচ্য রীতিনীতি বজায় রাখার চেষ্টা করতেন (আহসানুল্লাহ, তারিখে খান্দান পৃ. ২৩২ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব আবদুল গনির পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর সাথেও ইংরেজদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। ছেলে বেলায় তাঁকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য লন্ডনের জনৈক শিক্ষককে মাসিক এক হাজার টাকা বেতন দিয়ে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল (ওফারাশেদী থেকে উদ্ধৃত আবদুল্লাহ, ১৯৮৬)। ইংরেজি ভাষায় তাঁর এতই দখল ছিল যে অন্তরাল থেকে তাঁর কথা শুনে মনে হত যে, কোন অভিজাত ইংরেজ সাহেব কথা বলছেন (ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ এবং মোসলেম ক্রনিকেল, ২৫ ফেব্রুয়ার ১৮৯৯ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। ১৮৮৮ সালে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সাথে ঢাকায় আগত লেডি ডাফরিন তাঁর লেখায় আহসানুল্লাহর চমৎকার ইংরেজি বচনের প্রশংসা করেছেন (মার্ছিওনেস অব ডাফেরিন অ্যান্ড আভা, লন্ডন ১৮৯০ পৃ. ৪০১ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)।

নবাবদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চায় আগেই উল্লেখ করেছি তারা সাধারণত সূফীধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। সে সময়ে উপমহাদেশের অনেক মুসলিম দল, গোষ্ঠী ব্রিটিশ আমলে এদেশকে দারুল হারব বা শত্রুভূমি বলে মনে করত। এজন্য তাঁরা এদেশকে ঈদ, জুম্মার নামায ইত্যাদি ধর্মীয় কাজের উপযুক্ত স্থান নয় ভেবে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা দিত। মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি উক্ত গোঁড়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিল না। এজন্য ১৮৭০ সালের ২৩ নভেম্বর সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জৌনপুরের বিখ্যাত মৌলভী কারামত আলী বক্তৃতা দানের জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ব্রিটিশদের শাসনাধীনে থাকলেও ভারতবর্ষ দারুল হরব নয় বরং দারুল ইসলাম। সুতরাং শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ইসলাম ধর্মীয় নির্দেশের পরিপন্থী। তিনি ইসলাম ধর্ম থেকে অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন (এ্যাবসট্রাক্ট অব প্রসিডিংস অব মোহামেডান সোসাইটি অব ক্যালকাটা থেকে উদ্ধৃত করেছেন ওয়াকিল আহমেদ, ১৯৮৩)। উন্নত শক্তিশালী ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের সংগ্রাম হবে সম্পূর্ণ আত্মঘাতী ও ধ্বংসমুখী। নওয়াব আবদুল লতিফ ও তাঁর সহকর্মীরা তা অনুধাবন করে ঐরূপ একটি মীমাংসা বাণী কামনা করেছিলেন। আবদুল লতিফ কারামত আলীর বক্তৃতাসহ সভার পুরো ধারা বিবরণীর পাঁচ হাজার কপি ছাপিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। এমনকি তা মক্কায় পাঠিয়ে মুফতির কাছ থেকে সমর্থনসূচক ফতোয়াও আনা হয়েছিলো (আহমেদ, ১৯৭৪, পৃ. ১৭২)। এছাড়া ঢাকার নওয়াবদের সাথে অনেক আগে থেকেই জৌনপুরের পীর সাহেবদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। মৌলানা কারামত আলী ও তাঁর পুত্রগণ ধর্ম ও সমাজ সংস্কার কাজে বহুদিন পূর্ববঙ্গে অতিবাহিত করেন। ঢাকার নওয়াবগণ তাঁদেরকে এ কাজে প্রচুর সহায়তা করতেন। কারণ ঢাকার খাজা পরিবারটিও জৌনপুরী, দেওবন্দী ও ফুরফুরী মতবাদীদের ন্যায় তাকলীদপন্থী (চার ইমামের মধ্যে যেকোন একজনের মতাবলম্বী) ছিলেন। তাঁরা পীর-মুরিদী ও আধ্যাত্মিক তরিকার পক্ষপাতি ছিলেন। তবে পীর পূজা, কবর পূজা, জিকিরের নামে হারাম বাধ্যযন্ত্র গানবাজনা তাঁদের উভয়ের কাছেই অগ্রহণযোগ্য ছিল (আবদুল্লাহ, ১৯৯৫, পৃ. ১৫২)। নওয়াব আবদুল লতিফ যেমন তাঁর মতবাদের সমর্থনে মওলানা জৌনপুরীর

ফতোয়া সংগ্রহ করে প্রচার করেছিলেন। অনুরূপ ঢাকার নওয়াবদের কার্যকলাপও মওলানা জৌনপুরী সমর্থন করতেন। ফলে তাঁদের পক্ষে পূর্ববাংলার মুসলিমদেরকে সোসাইটির মতবাদে বিশ্বাসী বানাতে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভবপর হয়েছিলো (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ১৪৩)। সাম্প্রদায়িক সুসম্পর্ক বিনির্মাণে নবাবরা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কোনো ধর্ম ও বর্ণের প্রতি তারা বৈষম্যমুলক আচরণ না করে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করেছেন। মানুষকে উস্কে না দিয়ে বরং সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছেন। হোসেনী দালানের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে, নারায়ণগঞ্জে নবীগঞ্জে কদম রসুলের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে, হযরত শাহ আলীর দরগাহের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, সাত মসজিদ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে, শাহ মালিক পীর ইয়ামেনীর দরগাহ সংস্কার, চিশতী বেহশতীর মাজার সংস্কার, লালবাগ শাহী মসজিদ সংস্কারে, খাজা আম্বরের মসজিদ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে, শাহজালাল দাখিনীর মসজিদ ও মাজার এবং শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকিনের মাজার সংস্কার, হযরত শাহ মাউদ ও পীরজঙ্গীর দরগাহ সংস্কার, বাইগুণবাড়ি মসজিদ নির্মাণ, মাহাদরীপুর খাজা হাফিজুল্লাহ মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে, নেত্রকোনা খাজা আহসানুল্লাহ মসজিদ নির্মাণে এগিয়ে এসেছিলেন (আলমগীর; ২০১৪, ১৭৩-১৮৪)।

ইসলাম মানুষকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্য চর্চায় বরারবই উদ্ধুদ্ধ করে আসছে। এ সভ্যতা যেখানেই পৌছেয়েছে সেখানেই নয়নাভিরাম বাগান ও উদ্যান রচিত হয়েছে, এসব বাগান ও উদ্যানে চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা ছড়িয়েছে ইসলামি স্থাপত্য-চেতনা। আন্দালুস, তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, মিশর, সমরকন্দ, মরক্কো, তিউনিসিয়া, ইয়ামেন, ওমান, ভারত ও অন্যান্য এলাকায় এসব বাগান ও উদ্যানের ছড়াছড়ি ছিল (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ৬৩-৬৪)। খেলাফত যখন ভেঙ্গে গেল এবং নতুন শাসকদের উদ্ভব ঘটল, তারাও পদচ্যুত খলিফাদের রীতিনীতি অনুকরণ করতে কিছুমাত্র পিছপা হলো না। ফলে ওইসব কৃত্রিম বাগানের আধিক্য দেখা গেল, নতুন শাসকদের প্রাসাদগুলোর প্রত্যেকটিতেই একাধিক বাগান তৈরি হলো (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ৬৬)। ইসলামী সভ্যতায় বাগান করার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। ইসলামি বাগানগুলো কুরআন ও সুন্নাহে জান্নাতের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে অনুপ্রেরণাজাত। গাছ, পানি, নালা, আসন, ঘ্রাণ ইত্যাদিও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনারও অনুকরণ করা হয়েছে (সারজানি, ২০২১, পৃ. ৭৫-চতুর্থ খন্ড)। বাগান তৈরির উদ্দেশ্য ছিল এই পরিবেশকে আরও সুন্দর ও পরিপাটি করে তোলা। উদ্যানের ফটকগুলোতে ও দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ করা হয়েছে কুরআনের আয়াত বা হাদিসের অংশ বা অন্যান্য ইসলামী বাণী। বাড়িগুলোতে প্রচুর বাগান থাকত। আর এ বাগানগুলো হতো বাড়ির ভেতর-আঙ্গিনায়, যাতে গোপনীয়তা যথার্থভাবে বজায় থাকে এবং বাড়িগুলোতে যেন বড় চত্বর, উদ্যান ও গণমাঠের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে। ইসলামি দর্শন সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার প্রতি আবেগ ও আগ্রহের দিকটি গুরুত্ব দেয়, অন্যদিকে পাশ্চত্য দর্শন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বস্তুগত দিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতাকে এমনটি অভিমত জেমস ডিকির (সারজানি, ২০০৯, পৃ. ৭৮)।

ইসলামের এই সংস্কৃতির ধারা বজায় রেখেছিলো খাজা পরিবারও। তারা ঢাকা নগরকে পুনরায় পুনর্গঠন করেছিলো। যদিও মোগল আমলে সুবা বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকা সমৃদ্ধশালী নগরী হিসেবে প্রাচ্য-পাশ্চত্যে জৌলুসের দ্যুতি ছড়িয়েছিল। কিন্তু এখান থেকে রাজধানী স্থানান্তর হওয়ায় ধীরে ধীরে অবনতি ঘটায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে সেই ঔজ্বল্য ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছিলো। মোগল আমলে এ শহরের লোকসংখ্যা যেখানে প্রায় ন লাখ ছিল বলে জানা যায়, তা কমে কমে ১৮৩০ সালে মাত্র ৬৬ হাজারে এসে দাঁড়ায় (বার্ট, ১৯০৬ পৃ.২৪০; হোসেন, ১৯০৯, পৃ. ২০; দানী, ১৯৬২, পৃ. ১০৪)। লোকালয় জনাকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ঢাকা শহরের নানা অংশ জঙ্গলাকীর্ণ হয় এবং সে সাথে পয়ঃপ্রণালী মজে দূষিত ও বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়, এ সময় মোগল আমলে ঢাকায় নির্মিত ইমারতগুলো সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বসে পড়তে থাকে (বার্ট, ১৯০৬ পৃ.১৯৪)। আলমগীর তার মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থে আজিমুশ্মান এর উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, ১৮২৪

সালে বিশপ হেবার ঢাকার তিন-চতুর্থাংশ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইমারতের ধ্বংসস্তুপগুলোতে জঙ্গল ও বাদুড়ের বাসা দেখেছিলেন। টেইলর ১৮৩৫ থেকে ৪০ এর দিকে ঢাকা শহরের সর্বত্র ডোবা-খন্দক ভর্তি ময়লা-আবর্জনা ও দূষিত পানির কারণে একে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তিস্থরূপে দেখেছিলেন (টেইলর, ১৮৪০, পৃ.২৪৭, ২৫০-৫১, ২৮০)। তাই আজ থেকে দেড় দু'শ বছর আগে থেকে ঢাকাকে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, অসুন্দর, নোংরা এবং শহর হিসেবে নিরানন্দ মনে করা হতো (মামুন, ১৯৯০, পৃ.২৯)। ঢাকা নগরীর এমন সঙ্কটময় সময়ে ঢাকার খাজা পরিবার ও তাদের পরিবার থেকে নবাবরা যদি এগিয়ে না আসতেন তাহলে হয়ত সোনারগাঁও, রামপালের মত একদিন ঢাকা শহরের অস্তিত্বও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেত (আলমগীর, ২০১৪, ৬৪)। ঢাকায় নওয়াবের নিজস্ব প্রচেষ্টায় শহরের উত্তরাংশে শাহবাগ বাগানবাড়ি এবং উত্তর-পূর্বাংশে কোম্পানি বাগান ও দিলকুশা বাগান বাড়ি নির্মিত হয়। এ উদ্যোগগুলো শহরের নিরানন্দ পরিবেশকে বেশ কিছুটা আনন্দময় করতে সক্ষম হয় (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ৬৮)। পৌরসভা হিসেবে ১৮৪০ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। এ কমিটিতে ১৮জন সদস্যের মধ্যে খাজা আলীমুল্লাহ একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন (মজুমদার, ১৯১০ঃ পৃ. ১৮৬)। এ কমিটির সদস্য হিসেবে খাজা আলীমুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐ যুগে ঢাকা শহরে আর্মেনিয়, খ্রীষ্টান এমনকি গ্রীকদের জন্য নির্দিষ্ট কবরস্থানের ব্যবস্থা থাকলেও মুসলমানদের জন্য কোনো নির্ধরিত গোরস্থান ছিল না। লোকেরা যেখানে ইচ্ছা এমনকি বাড়ির আঙ্গিনায় মৃতদেহ দাপন করত। এ ব্যবস্থাটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর ছিল। মুসলমানদের গোরস্থানের জন্য উক্ত কমিটি ঢাকার নারিন্দা, আগাসাদেক ময়দান, ফিনিক্স পার্ক, লালবাগ ও নওয়াবগঞ্জ এ পাঁচটি এলাকায় স্থান নির্বাচন করে (আলমগীর, ২০১৪,পৃ. ৬৬)। বেগমবাজার এলাকায় ঢাকার নওয়াবদের দুটি পারিবারিক গোরস্থান আজও বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক শহরের মুসলমানদের সুবির্ধার্থে গোরস্থান নির্মাণ ও সংস্কারে তাঁরা প্রচুর অর্থ সাহায্য দেন। ১৮৮৭ সালে ঢাকা শহরে গোরস্থান নির্মাণে নওয়াব আহসানুল্লাহ পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। ঢাকা শহরের দরিদ্র ও অসমর্থ ব্যক্তিদের মৃতদেহ সৎকারে ঢাকার নওয়াবগণ আর্থিক সহায়তা করতেন। বিশেষ করে মিটফোর্ড হাসপাতালের গরীব ও বেওয়ারিশ লাশ দাফন কাফনের জন্য খাজা পরিবারে একটি বিশেষ তহবিল বরাদ্দ ছিল (পুরনো নথি, পৃঃ ডি-২২ এবং পুরনো দলিল, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াব আবদুল গনির দানে সর্বপ্রথম ঢাকা শহরে নলকূপের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয়। তাতে পিতা ও পুত্র মিলে এ কাজে দেড়লক্ষ টাকা দান করেন। পরবর্তীতে আরও ২০ হাজার টাকা দান করেন (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ৭৯)। নওয়াব আবদুল গনি তাঁর বক্তৃতায় নলকূপ সংস্থাপন কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহর কাছে শোকর গোজার করেন। তিনি বলেন, ঢাকায় নলকূপ এর মাধ্যমে পানির ব্যবস্থা করা তাঁর একটি স্বপ্ন ছিল। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাহায্যকারী ব্রিটিশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন (ঢাকা প্রকাশ, ২৬ মে ১৮৭৮ পৃঃ ১২৫ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহর বিয়ের আমোদ-প্রমোদ না করে নওয়াব আহসানুল্লাহ এ বিয়ের স্মরণে ঢাকা শহরে বিদ্যুতালোক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এজন্য প্রথমে চার লক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। এই কাজে নওয়াবের সর্বমোট সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিলো (ঢাকা প্রকাশ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯০০ পৃ. ৬-৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আলমগীর ২০১৪)। গবেষক নাজিয়া খানম তার পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন তৎকালীন সময়ে কলকাতার বাইরে কেবলমাত্র দার্জিলিং এর পরে ঢাকাই ছিল বঙ্গের দ্বিতীয় নগরী যা আধুনিক সভ্যতার আঁকর এই বিদ্যুতালোক পেয়ে ধন্য হয়েছিল (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ৮৮)। আধুনিক সভ্যতার আকর-উৎস হিসেবে পরিচিত বিদ্যুৎ না হলে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ অসম্ভব। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকা শহরে ঐ বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে এক যূগান্তকারী কাজ সম্পন্ন করেন। ইহা ছিল ঢাকার উন্নতির সোপানস্বরূপ। এর ফলে ঢাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, কলকারখানার উন্নতি সাধিত হয়। আধুনিক ঢাকার সৃষ্টিতে নওয়াব আবদুল গনির নলকূপ স্থাপনের পর নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক বিদ্যুতালোক প্রবর্তন ছিল ঢাকাকে আধুনিকরূপ দানের দ্বিতীয় কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা

(আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ৮৯)। এ বিষয়ে কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন বাংলাদেশে বিদ্যুৎ এর আগমন ঘটে নওয়াব আহসানুল্লাহ এর হাত ধরে। তিনি ঐ সময়ে ঢাকা শহরে বিদ্যুতের ছোয়া দেওয়ার মাধ্যমে এমন এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যময় ঘটনার জন্ম দেন, যা ছিল ঢাকার টেকসই উন্নতির সোপান। এর ফলে ঢাকায় জমজমাট ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, কলকারখানার উন্নতি সাধিত হয়। আধুনিক ঢাকা গড়তে নওয়াব আবদুল গনির নলকূপ স্থাপনের পর তাঁর সন্তান নওয়াব আহসানুল্লাহ যে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা করেন তা ঢাকাকে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসারে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে (মজুমদার, ১৯১০, পৃ.১৮৬)। সে হিসেবে বলা যায় নবাবরাই বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটালের যাত্রা শুরু করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধানেও পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন ঢাকার এই খাঁজা নবাব পরিবার। ঢাকায় পঞ্চায়েত প্রথা পূর্ব থেকেই চালু থাকলেও নওয়াব আবদুল গণির প্রচেষ্টায় তা পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হয়। ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের পূর্বে এদেশে বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার ভার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতে ন্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনে পঞ্চায়েতের এ ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। নওয়াব আবদুল গণির প্রচেষ্টায় ১৮৮৮ সালে এ ক্ষমতা আবার পঞ্চায়েত প্রধানদের কাছে অনেকটা ফিরে আসে (হোসেন, ১৯৯৫ পৃ. ৫৩৪)। নওয়াব আবদুল গণির জমিদারীতে এ মর্মে কড়া নির্দেশ দেয়া ছিল যে, তাঁর সালিসী শেষ না করে কেউ যেন সরকারি আদালতের স্বরণাপন্ন না হয় (ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জানুয়ারি ১৮৮৮ পৃঃ ৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন আলমগীর, ২০১৪)। ঢাকাবাসীর উপর খাজা পরিবারের অনুরূপ প্রভাব ও কর্তৃত্ব নওয়াব সলিমুল্লাহর জীবনকাল পর্যন্ত পুরোপুরি অটুট ছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকার পঞ্চায়েত প্রথা উন্নয়নকল্পে বারো এবং বাইশ পঞ্চায়েতকে একত্রিত করেন এবং ১৯০৭ সালে খাজা মোঃ আজমকে এর সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেন (আজম, ১৯৯০, পৃ. ৩৩-৩৪)।

সার্বিক দৃশ্যপটে প্রতীয়মান, আঠারশতকে খাজা পরিবার ও তাদের বংশের নবাবরা এই ঢাকার নগর পুনর্গঠনে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে ভূমিকা রেখেছেন। যা ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্টগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত ছিলো। বংশ পরম্পরায় তারা সচেতন, অবচেতন কিংবা যেভাবেই হোক এই ধারা চলমান রেখেছিলেন। ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশিকতার মধ্য থেকে একটি বৈরি সময়ে নিজেদেরকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলে, একটি শিক্ষিত, দানশীল, ধর্মীয় ভামগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উগ্রপন্থা নয় বরং মধ্যম জাতি হিসেবে মুসলিমদের কর্মকান্ডকে নিখুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ

শাহনাওয়াজ, এ.কে.এম (১৯৯৯). মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি. ঢাকা: বাংলা একাডেমি

আহমদ, ওয়াকিল (১৯৮৫). বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০). ঢাকা: বাংলা একাডেমী,

হোসেন, নাজির (১৯৯৫). কিংবদন্তির ঢাকা (তৃতীয় সংস্করণ). ঢাকা: থ্রিস্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

মামুন, মুনতাসীর (২০১৭). সংবাদ-সাময়িকপত্রে ঢাকার নওয়াব পরিবার (কথাপ্রকাশ সংস্করণ). ঢাকা: কথা প্রকাশ

মামুন, মুনতাসীর (১৯৯৪). ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী (প্রথম পুর্নমুদ্রণ). ঢাকা: অনন্যা

হায়াৎ, অনুপম (২০১৮). ঢাকার নওয়াব পরিবারের ডায়েরি, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

আলমগীর, মোঃ (২০১৪). মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান, ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল

ইসলাম, রফিকুল (২০১৭). ঢাকার কথা (১৬১০-১৯১০) প্রথম সংস্করণ. ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

সেন, আদিনাথ (১৯৪৮). দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ (২). কলিকাতা প্রকাশনী.

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ (১৯৮৬). নওয়াব সলিমুল্লাহ জীবন ও কর্ম. প্রথম প্রকাশ, ঢাকা
আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ (১৯৯১). ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী. প্রথম প্রকাশ, ঢাকা
আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ (১৯৯৫). মওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রঃ). ঢাকা
মজুমদার, কেদারনাথ (১৯১০). ঢাকার বিবরণ. ময়মনসিংহ
আলম, দেওয়ান শফিউল (১৯৬৪). নবাব বাহাদুর সলিমুল্লাহ (প্রথম সংস্করণ). ঢাকা
নওয়াব আলী চৌধুরী, সৈয়দ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কার্যবিরণী ও সমালোচনা (১৯০৬-১২)
হাসান, শফিউল, মাহমুদ,হানিফ (সম্পাদক) (২০১৬). কালপুরুষ ঔপনিবেশিক বাংলা হাজী মুহাম্মাদ মহসীন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ, বণিকবার্তা)
আজম, মামুন, মুনতাসীর (সম্পাদক) (১৯৯০), দি পঞ্চায়েত সিস্টেম অব ঢাকা, বাংলাদেশ, ঢাকা নগর জাদুঘর
জেমস টেইলর (১৮৪০), টপোগ্রাফি অব ঢাকা, (আসাদুজ্জামান). ঢাকা-বাংলাদেশ: অবসর
সারজানি, রাগীব (২০০৯). মা-যা কাদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম, (সাত্তার আইনী). ঢাকা-বাংলাদেশ: মাকতাবাতুল হাসান
রহিম, এম.এ (১৯৮৫). সোশ্যাল এন্ডকালচারাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল-প্রথম পুনর্মুদ্রণ (মোহাঃ আসাদুজ্জামান) ঢাকা: বাংলা একাডেমী
তায়েশ, (২০১৬) তাওয়ারিখে ঢাকা (ঢঃ আ.ন.ম. শরফুদ্দিন). ঢাকা-বাংলাদেশ: দিব্য প্রকাশ
Karim, Abdul (1964). Dacca The Mughal Capital. Dacca: Asiatic Press
Haider, Azimusshan (1967). Dacca: History and Romance in place Names (1st Printed). Dacca: Dacca Municipality
Haider, Azimusshan (1966). A city and its civic Body (1st printed). Dacca: Dacca Municipality
Buckland, C.E. (2017). Bengla under the Lieutenant Governors (Vol-II). Calcutta:Forgotten Books
Claude Campbell, A (1907). Glimpses of Bengal (Vol-I). Calcutta
Dani, Ahmad Hasan (1962). Dacca A rocod of its Changing Fortunes (second edition)
Rahim, M.A. (1978). Muslim Society and politics in Bengal (1757-1947). Dhaka
Rahim, M.A. (1963). Social and cultural History of Bengla
Rahim, M.A. (1981). History of the University of Dhaka (1st edition). Dhaka
Ahmed Sharif Uddin (1991). Dhaka past present Future (edited). Dhaka
Ahmed, Sufia (1974). Muslim Community in Bengal (1884-1912). Dhaka
Taifoor, S.M. (1956). Glimpsess of old Dhaka (2nd edition). Dhaka
Birt, Bradley (1906). Romance of an Eastern Capital. London